নিবেদন

পাঠক-পাঠিকাদের নিজস্ব যাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
মানবজীবনে চলার পথে সঞ্চিত নানান জীবন অভিজ্ঞতার কুসুমকলিকে
প্রস্ফুটিত করার আমাদের এ এক ক্ষুদ্র প্রয়াস ঃ

□ সম্পাদকমণ্ডলী □

সভাপতি □
অধ্যাপক ড. গৌতম ভট্টাচার্য

প্রধান উপদেষ্টা □
শ্রী অপূর্ব কর্মকার, শ্রী অসীমবন্ধু খাঁড়া

সদস্যবৃন্দ □
ডা. বিপদতারন দাস, ড. অনিন্দ্যবন্ধু গুহ, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রঙ্গা, শ্রীমতী সুস্মিতা ত্রিপাঠী (ব্যানার্জী), শ্রীমতী তৃপ্তি রায়, ড. অমলেন্দু হাজরা, শ্রী অভিজিৎ লাহিড়ী, শ্রীমতী চম্পা পাল

প্রকাশনা উপদেষ্টা □
জয়ন্ত সুকুল

সম্পাদক □
শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

'নিবেদন' একটি ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনি, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য সৃষ্টিমূলক লেখার প্রকাশের এক বিচরণভূমি। পূর্ব বেহালার জয়শ্রী মোড়সংলগ্ন এলাকার কয়েকজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ যাঁরা অন্তরে বহুদিন ধরে লালনপালন করে আসছেন এইরকম একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা। যাঁরা এই পত্রিকায় লিখেছেন তাঁরা সকলেই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেকে আবার বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তও আছেন। তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ কর্মজীবনের চলমান পরিসরে অর্জন করা ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাভাবনাগুলি স্ব স্ব লিখন প্রকাশের রসোত্তীর্ণ করে চলেছেন। আমরা খুবই ভাগ্যবান এবং আশাবাদী যে, ওনাদের এইসব লেখাগুলি আমাদের সকল পাঠকসত্তাকে শিল্পিত ও সুষমামণ্ডিত করে তুলবেই। সমগ্র পাঠককুলকে এক নতুন সাহিত্যের ভুবনে পাড়ি দিতে অনুপ্রেরণাও জোগাবে।

শুধু তাই নয়, আমরা আপনাদের লেখা ও মতামত আমাদের কাছে পাঠাতে আবেদন করছি। পরিশেষে, সকল লেখক-লেখিকা, সম্পাদকমণ্ডলী, বিজ্ঞাপনদাতাগণ, মুদ্রক মহাশয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা এই পত্রিকা পাঠক জনসমক্ষে আনতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদক
শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

‘**নিবেদন**’-এর সার্বিক যোগাযোগের ঠিকানা □

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

৭০/১১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪

দূরভাষ ঃ ৯০৫১১ ৯২১৮০ (হোয়াটসঅ্যাপ)

শ্রী অপূর্ব কর্মকার

৭০বি/১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪

দূরভাষ □৮৯৮১০ ২১৯৫৬ (হোয়াটসঅ্যাপ)

লেখা পাঠান-ওপরের Whatsapp ও e-mail : iapurbakarmakar@gmail.com-এর মাধ্যমে। Unicode বাঞ্ছনীয়, PDF নয়, Word File পাঠান, সঙ্গে ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অনুগ্রহ করে অবশ্যই জানাবেন।

□ সূচিপত্র □

বিভাগ	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা	প্রকৃতি মাতৃকা	স্নিগ্ধা পাল	৫
	নব উৎসব	ডা. বিপদতারন দাস	৬
	অন্ধকার	অভিজিৎ লাহিড়ী	৭
	শেয়ালের চোখ	,,	৭
	সবকিছু বদলে যায়	ড. অমলেন্দু হাজরা	৮
	ভারতবর্ষ	মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল	৯
	প্রভাতের প্রার্থনা	সুশান্ত কুমার বোস	৯
	আমার কবিতা	সোমা দাস	৯
ভ্রমণকাহিনি	Impression of Japan Tokyo	Dr. Goutam Bhattacharya	১০
	একটি ভ্রমণের স্বর্ণালি অনুভূতি	মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়	১৬
গল্প	নতুন পেশা	অপূর্ব কর্মকার	১৭
	ধূসর বসন্ত	সুস্মিতা ত্রিপাঠী (ব্যানার্জী)	১৯
	ওরা	মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	২১
	প্রশ্রয়	জয়ন্ত সুকুল	২৩
	সমর্পণ	সমরকৃষ্ণ মণ্ডল	২৬
	চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্ম	অপূর্ব মিত্র	৩৪
	রাজনীতির গল্প	ড. দেবদাস মণ্ডল	৩৮

কবিতা

প্রকৃতি মাতৃকা

স্নিগ্ধা পাল

জল মাটি আর বাতাস আলোয়
রূপে গুণে সুসজ্জিতা
তারই কোলে জন্ম তোমার
এই প্রকৃতি মাতৃকা।
সাগর পাহাড় বন নদী আর
তুষার জমাট পর্বতে
তার-ই বুকে সুবাস ছড়ায়
নানান ফুলের গন্ধেতে।
মন দিয়ে কি দেখেছ তাকে
কেমন তোমার প্রকৃতি মা
উপলব্ধি কি করেছ তাকে
তাকেই ছাড়া বাঁচব না?
ভোরের বেলার সূর্য ওঠা
পুব আকাশের কোণটাতে
দাঁড়িয়ে ছাদে দেখেছ কি
অপূর্ব সেই রূপটাকে।
বৃষ্টিভেজা রাস্তাঘাটের রূপ
কিংবা ঝড়ের পরদিনে
কি রূপ তখন হয় প্রকৃতির
দেখেছ কি আনমনে?
মৃদুমন্দ বইলে বাতাস
গাছের পাতায় শিহরন
ভোরের শিশির নকশা আঁকে
মাঠের ঘাসে অনুক্ষণ।
শেষ বিকেলে সূর্য ডোবে
দূর নিলীমার কিনারে
পাখিরা সব বাসায় ফেরে
কিচিরমিচির রব করে।
ভোরের বেলায় ওই পাখিরা
মধুর সুরে তান ধরে
ঘুম ভাঙানোর মন্ত্র শেখে
প্রকৃতি মা-এর হাত ধরে।
বর্ষারানি নেমে আসে
মেঘের গুরু গর্জনে
ভেজা মাটির গন্ধ মনে
সবুজ প্রাণের স্পন্দনে।

শরৎ কালের নীল আকাশে
সাদা মেঘের জলপরি
শিউলি, বেল আর জুঁই-এর সুবাস
সবার করে মন চুরি।
চাঁদের আলোয় আকাশ ভরে
পূর্ণিমার ওই রাতে
চোখ মেলে কি দ্যাখো সেথা
তারায় ছবি আঁকে?
দখিনা হাওয়ার হিল্লোলেতে
ভরে তোমার প্রাণ
তখন তুমি জানবে এসব
প্রকৃতি মা-এর দান।
দেখেছ কি প্রকৃতি মায়ের
নদীর রূপের ব্যঞ্জনা
শুনেছ কি তার গানের ছন্দ
এতো সুরের মূর্ছনা?
প্রকৃতির এই রূপের খেলায়
আমরা মনমুগ্ধ হই
সেই প্রকৃতি ধ্বংস করে
আমরা তাকে কষ্ট দিই।
সন্তানকে আগলে কোলে
যত্নে রাখেন মা
প্রকৃতি তো মাতৃসম
মানুষ বোঝে না।
তাই প্রকৃতির সন্তান আজ
আমরা শপথ নিই
সারা বছর বৃক্ষরোপণ
ঋণ পরিশোধ দিই।

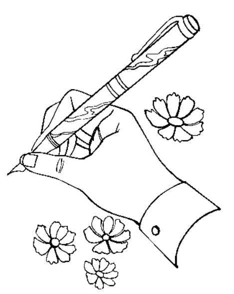

নব উৎসব

ডা. বিপদতারন দাস

তাত্ত্বিক সাহেবরা বলে, ভারতবর্ষ
নাকি তৃতীয় বিশ্ব!
আমার ভারতবর্ষ মানে
রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নবজাগরণ!
নিন্দুকেরা বলে, ভারতবর্ষ মানে অশিক্ষা, কু-শিক্ষা,
দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়ন-এর আখড়া!

গ্রামে, শহরে, নগরে
অঞ্চলে, প্রদেশে এবং দেশে
দুরাত্মাদের লোলুপ দৃষ্টি
ডিজিট্যাল ক্যামেরার মতো
করে নজরবন্দি
সমস্ত রিক্ততা এবং দুর্বলতা,
ওঁত পেতে থাকে
হিংস্র শিকারিসম,
ঘটে চলে আবহমান
লুটপাট, খুন আর ধর্ষণ!

আমার ভালোবাসার ভারতবর্ষে
উৎসব আসে পরম্পরায়
বারো মাসে তেরোপার্বণ
তবুও সৃষ্টি হয়, নব নব,
হরির নামে লুট হয়
তোমার আমার রক্তক্ষরণ!

আমার স্বপ্ন দেখা ভারতবর্ষে
উৎসব আসে আরও
খরা, বন্যা, তুফান
এবং ভোট পরবে!
হয় দলবদল
ওড়ে নোটের হিল্লোল!

মাফিয়া, গুন্ডা, চোরাচালান
হয় আগুয়ান
সঙ্গে থাকে ক্ষমতাবান!
ওঠে তোলা, চলে ফোয়ারা,
ভোটবাক্সে শুধুই আমরা
রহিবে না কোনো 'ওরা'।

আমার ভারতবর্ষ মানে
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর
আত্মবলিদান,
বিপিন পাল, ঋষি অরবিন্দর
ক্ষুরধার আন্দোলন,
বঙ্কিম, নজরুল, রবি ঠাকুরের
দেশাত্মবোধ,
নেতাজির রক্তক্ষয়ী বিপ্লব
শোষক সাম্রাজ্যবাদের হয়েছে
উন্মূলন,
আমার ভারতবর্ষে
এখন আসুক নেমে
রবিনহুড এবং মেরি ম্যান!

দুটি কবিতা। অভিজিৎ লাহিড়ী

অন্ধকার

রামধনুর মতো বিষণ্ণতা চতুর্দিকে বলয় তৈরি করেছে।
স্যাঁতসেঁতে ভিজে বাতাসের মতো মন খারাপ;
ধুলো ঝড়ের মতো উড়িয়ে দিল সব স্মৃতি
সম্পর্কগুলো ক্রমশ আশ্রয়হীন হয়েছে।

এই মন খারাপের খবর আমরা সবাই জানি
আবার হয়ত, আমরা কেউ খবরও রাখি না,
অবসাদে বন্ধ দরজায় কতবার মাথা ঠুকি,
সূর্য হারা একমুঠো অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত হই।

কত বার যাচ্ছি ও ফিরছি আত্মহননের মুহূর্তটুকু থেকে
কেমন করে যেতে হয় তা বুঝি না,
কেমন করে ফিরে আসছি জানি না,
অমৃতভরা স্বপ্ন বারবার টেনে ধরে স্মৃতিকে।

কোনোদিন হয়ত আর ফিরবে না খ্যাপা
পরশপাথর যে সত্যিই পাওয়া হয়ে ওঠেনি,
খুব কাছের তুমি বা তোমরা জানতেও পারবে না,
যাওয়া আর ফেরার পথের দূরত্ব কতখানি!

এভাবেই কত না-বলা, না-জানা থেকে যায়,
শেষের সেকথা অব্যক্তই ডুবে যায় গভীরে।

শেয়ালের চোখ

কোনোদিনও সে চোখে চোখ রেখেছ?
ধূর্ততা, অসততা, মিথ্যাচারিতায় জ্বলজ্বল
দুটি চোখ।
ভালোবাসা, সততা, সম্মান সেখানে লুপ্ত,
অহংকার আর দম্ভ সে চোখে সদাই সুপ্ত।
মূল্যবোধ, বিশ্বাস জীবনের স্থিরতা সেখানে হেয়,
সুখ, শান্তি, মন ও মনন সেখানে অবজ্ঞেয়,
ভালোবেসে যতবার সেই চোখের গভীরে যাবে মন
ততবার বেইমানি ও অবজ্ঞায় হৃদয় জ্বলে যাবে।
অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে সে চোখের আগুনে তুমি
শেষ হবেই হবে।
রেখেছ কোনোদিনও শেয়ালের চোখে চোখ?

সব কিছু বদলে যায়

অধ্যাপক অমলেন্দু হাজরা

সব কিছু বদলে যায় সময়ে
যেখানে বস্তি ছিল সেখানে এখন
ফ্ল্যাট জমজমাট অ্যারিস্টোক্রেসি।

সুইট হোম ক্রমশ অদৃশ্য হয়
মাটি বাগান থেকে সাত তলা
আঠারো তলার আকাশে।

যে দুধ বিক্রি করত-খাটাল ছিল
সে এখন সবজি বিক্রি করে
খাটালে ফ্ল্যাট উঠেছে আর সে
বদলে ফ্ল্যাট পেয়েছে।
যে গান গাইত শিক্ষা দিত।
সে এখন দর্জি হয়ে
ব্লাউজ, ঘাঘরা বানায়
আর যে ইঞ্জিনিয়ার ভারী মেশিন দেখত
সে চাকরি ছেড়ে
অভিনয় বর্তমানে সংগীত
নিয়ে ব্যস্ত এখন।
খ্যাতিমান ডাক্তার ডাক্তারি ছেড়ে
স্কুল বানিয়ে তদারকি করে।

একসময় যে সবুজ রঙ পছন্দ করত
এখন সে হলুদের ভক্ত
একদিন যে মিষ্টি দেখে আহ্লাদ পেত
এখন সে ঝাল-নোনতায় সুখ পায়

বদলে যায় সময়ের সাথে
সব কিছু, সব দৃশ্য
তবে কি মৃত্যুরও দৃশ্য ক্ষণিক!

তারপর সে দৃশ্য আবার গতি
নতুন আহ্লাদ শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে
দেখা দেবে নতুন দৃশ্য হয়ে
কঠিনতম প্রশ্ন এটি পৃথিবীতে
যার উত্তর নেই অথচ তার উপর
নির্ভর করে চলছে মানুষের
রুচি-স্বভাব-রাজ্য-সমাজ।

বুদ্ধের সম্মতিতত্ত্ব — স্বভাব প্রতীত্যসমুৎপাদ
যার সোজা প্রমাণ নেই
আছে কেবল অনুমান বিশ্বাস
কেন-না এ দৃশ্য উপভোগ করার পর
উত্তর দিতে নির্ভরযোগ্য কেউ
আর ফিরে আসে না।

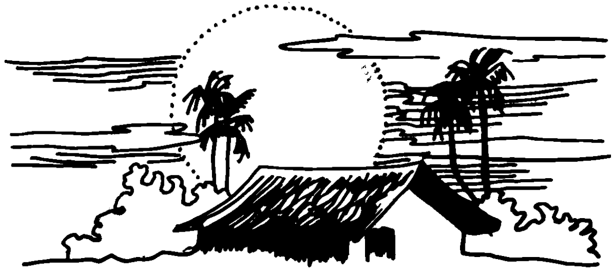

ভারতবর্ষ

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

অনেক মৃত্যুর পথ পেরিয়ে,
অনেক দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে
আলোকের পথযাত্রী এক নারী।
বুকে তার সন্তানের শব,
রক্তমাখা দুটি হাতে সোনালি ধানের সম্ভার,
মঙ্গলশঙ্খে বরণ করো এই নারীকে।
এই নারী আমার মা, আমার ভারতবর্ষ;
গাও জীবনের গান,
গাও মৃত্যু জয়ের গান।
বলো জয় হোক সত্যের
বলো জয় হোক শিবের
বলো জয় হোক সুন্দরের।

আমার কবিতা

সোমা দাস

রোজ কলমের রক্ত ঝরুক
আঁচড়গুলো উঠুক জ্বলে।
শব্দগুচ্ছ হোক-না আলো
ভাবনা মানেস্থিত হলে।
রোজ ভাবি যা কত কথা
আকাশ অতল তলে
কবিতা আমার হোক কলরব
বিবেক দংশ ফলে।

প্রভাতের প্রার্থনা

সুশান্ত কুমার বোস

মনের মুকুরে বিম্বিত হয়
স্নিগ্ধ ভোরের আলো,
সময় হয়েছে আরতি করার
এবার প্রদীপ জ্বালো।
তোমার চরণে আমরা সকলে
মিনতি জানাই আজ,
পবিত্র করো আমাদের তুমি
দয়া করো মহারাজ।
চোরাপথ বেয়ে মনের গভীরে
পাপের প্রকৃতি এলে,
সকরুণ হাতে মুছে দিয়ো তাকে
পারিজাত সুধা ঢেলে।
নির্মমভাবে শেষ করে দাও
কালিমা কলুষ যত,
শুভ চেতনার রঙিন পদ্ম
ফুটে থাক অবিরত।
মধু প্রীতিঘন মায়া মমতা
সকলের মনে দিয়ো,
মানবহৃদয়ে পরিয়ে দিয়ো গো
প্রেমের উত্তরীয়।
পৃথিবীতে যত সদ্‌গুণ আছে
নতুন সুরভী পাক,
উত্তরণের এই প্রার্থনা আজ
জাগ্রত হয়ে থাক।

ভ্রমণকাহিনি

Impressions of Japan - Tokyo, June 2018

Professor Dr. Goutam Bhattacharya

You don't understand Japan and the Japanese until you actually visit Japan and observe the behavior of your Japanese friends (both in Japan and abroad) over a period of time. Now I have done both. This does not make me an expert on Japan. Yet the conclusions I will draw by myself are not in any book or film or video. These are unwritten and unpublished truths about the Japanese society. So here they come (without much evidence!) – I invoke my freedom of expression rights, so you absolutely have the right to vehemently disagree with me.

The Japanese have many rules and customs and etiquette - some formal, some informal, some strictly enforced, some expected of good citizens. They are crazy polite. If you go to a store to buy a loaf of bread, somebody will bow to you at the door, and will say 'connichewa' (hello). You will have to do the same. When you come near the shelf where they keep the bread, another employee will notice you, bow and say hello and possibly enquire about your shopping needs. You will need to bow and speak with him and smile. When you are going to the cash counter, another employee will thank you for your patronage and ask you some additional questions. You will need to bow and smile and talk to him or her.

Finally at the cash counter, more bowing exchanging pleasantries and a round of 'arigato' (thank you). At the exit door, another bow and more pleasantries exchanged. In India, some stores may have a lot of employees on their sales staff, but you can ignore them. In Japan, you have to speak to everyone, and BOW until your waist hurts. Almost all of us foreigners can not possibly follow these customs and many others that are followed by the Japanese every day! We are excused by the Japanese for failing their standards but at the same time, under all the politeness, they feel smug at our lack of sophistication. As a result, the Japanese think we foreigners are rude and impolite in general.

The Japanese do not care much about diversity. They like their society as it is, almost entirely consisting of ethnic Japanese. There is now a sprinkling of working foreigners and students. Of late, the resident hafus (mixed race) have grown up. If they are successful, they are celebrated (like Naomi Osaka). If not, they are tolerated and suffer quiet but persistent discrimination throughout their lives.

The Japanese do not care about economic growth that much - in fact stagnation is OK with them. They already have a high standard of living and they want to stagnate around that forever.

No drugs, no crime, decent food, excellent transportation and entertainment options, and decent salary and Job security even for the lowest level jobs - the Japanese

have quite a high standard of living indeed. Apartments, like hotel rooms, are tiny but clean and efficient - and outside Tokyo, they are not that tiny!

The Western media cares more about Japanese stagnation than the Japanese citizens.

Nor are the Japanese worried about declining birthrates or decline in the number of married people. The Western media write alarmist articles frequently about the decline in Japanese family life, and the depression and the high suicide rate. Any evening of the week, there are huge crowds on the streets, shopping, eating and having fun - not consistent with a depressed society.

Mostly, the Japanese do not wish to travel to uncivilized countries in Asia (includes India, Malaysia etc.) or Africa or Latin America. USA and Western Europe are OK. I have kept in touch with many Japanese friends since our university days about forty years ago. Everyone has travelled to many western countries during these years, but not a single person has visited India. The thought of visiting India with its lack of discipline and order, along with the dirt and poverty terrorizes the Japanese people (at least discourages them). You will see bus loads of Japanese tourists all over Europe and USA, not at all in India or other South Asian countries. The Japanese travellers to India will be heretics and outliers.

The Japanese love Japan. Even with foreign degrees, good jobs in USA or Europe, they will ultimately return to the land of the rising Sun unlike us Indians or Chinese or others.

In our Ph.D. Program in University of Rochester, among our contemporaries in economics, there were five Japanese, four Indians, one Taiwanese, one Israeli, one Mexican, and about seven Americans. All of these students worked in USA all their lives after finishing their Ph.D's. Except, the Mexican guy was from an aristocratic Mexican family, so he went back after a while and eventually became Mexico's finance minister. The Israeli man went back to the most prestigious university in Israel, and all the Japanese guys went back to Japan, gladly giving up economic opportunities in USA. We, Indians gladly gave up our country for economic opportunities in the USA.

Many US universities have a small number of Japanese born faculty – they are there because of their academic or personal interests. They also often go back to Japan after about ten or fifteen years in USA Compare this to Indians in our generation – none of us went back to work in India, ever. The only Indians with Ph.D.'s in economics that went back were the ones who did not get a single job offer in USA. Ashim Dasgupta was no exception - his Ph.D. thesis from MIT was below par and he never got a job offer.

The Japanese like to claim that they work very hard, in fact they quote long working hours and high burnout rates etc., to prove this. While some people of course work very hard and/or burn out (in every

country), a little more probing will reveal the following.

A lot of work is 'pretend' make-up work. In order to submit a report to a high level employee of the same company in a different office, e-mail or fax is supposedly insulting. Somebody has to go clear across town to deliver the report, chat with the employee and may be have coffee. Five hours of 'hard work' that could be accomplished in one minute!

In a University, a lot of professors bring sleeping bags and sleep in their offices because they are doing so much research! You can draw your own conclusions (hint: they sleep at night in their offices!).

Every evening, in the central business and entertainment district (Shinjuku, where I stayed for four nights), there are literally hundreds of bars and restaurants and they are all packed from early evening. Who are these people? Tourists? Teenagers? Singles hunting for partners? Yes, some of them are but these still do dot explain the huge crowds every single night. We are looking at an area about twenty times the size of Park Street in Kolkata, or Times Square in New York City, with bars and restaurants at almost every building! And there are similar areas in Central Tokyo and many other places. The crowd consists of people working! They are conducting important business meetings! Yes, drinking, eating, smoking, chatting and may be talking business a little bit. All on company time. I won't mind working hard like that! After all that hard work, they are too tired (drunk) to go home, so they crash at a cheap hotel, and go back to the office in disarray the next morning and proudly claim that they worked so hard the previous day.

Because the way they are brought up, the Japanese are socially awkward. In the famous cat cafe, I saw Japanese men quietly sitting next to cats, not interacting with them, after paying a hefty admission fee to go in and play with cats! In the subway or train, restaurant, or even in a park, many people are working on their phones or laptops instead of talking. This accentuates the hard work syndrome!

All tourist spots temples, shrines, parks, iconic buildings are all packed with Japanese people every day in addition to foreign tourists. Tourists from outside Tokyo? Well, they are supposed to be working hard too! My guess is that the Japanese get a lot of days off from their arduous work schedule, they just don't want to admit that they do!

Overall, I have felt that the Japanese think that they are superior to others in the world. The people from Asia and Africa are deemed to be uncivilized and without manners – more so than people from Europe! Obviously, not everyone in Japan holds these opinions, there are many exceptions!

Now I write about the good stuff! Japan's society is so outstanding in many ways that I would happily vacation there every year even if all the above stereotypes are true for every single Japanese person (and they are not, obviously!).

Transport :

The transportation hubs in Tokyo are

massive! They were overwhelming to me when I landed in Tokyo, but once you figure out everything, is really impressive and well-organized. Shinjuku station has five floors, one for subway trains, one for long-distance trains, one for long-distance buses, one for local buses, and one level for taxis and private cars. You can plan your nation-wide travel itinerary from that one place! And the entire building is full of restaurants and takeaway places and it is next to huge shopping areas. I had a hotel near the station. I took a train from Narita international airport to here on arrival in Japan, then used the same Shinjuku station for subway rides inside Tokyo and left by long-distance bus from the same Shinjuku station for Mt. Fuji. Subway trains are numerous and color-coded and well-organized, yet I managed to get lost on the first day and had to rebuy my tickets, so there after I bought an all-day ticket every day in Tokyo, and Kyoto and Osaka.

The cleanliness of the streets is striking! They do not allow smoking on the streets because the ash from your cigarette will make the streets dirty (not the butts which you can dispose of separately).

Surprisingly, you can smoke in many bars and restaurants because the Japanese respect your private space, although this is changing fast! But heck, I have no idea how they keep the streets and the side walk spotlessly clean even in high traffic areas.

Manners :

The discipline and the politeness of the people working everywhere is amazing! They actually learn politeness and cleanliness at schools. In primary schools, students have one class period allocated to cleaning their own class rooms and toilets (Yes, try this in India!!)

People everywhere think they are well paid. Thus you do not tip the wait staff in restaurants or the taxi drivers in Japan because they are insulted if you do so (no kidding)!

The politeness of people on the street and in social situations is totally off the charts! I think in Tokyo, you can take off all your clothes and step into a busy street while playing with your private parts and you will be summarily ignored until the Police politely asks you if you need help (alright, I made this one up, this is not true!).

You will see bicyclists riding for about 20 meters on the sidewalk, stopping because they would not use the bell to distract the pedestrians in front and dismounting and walking behind them until they can ride again may be this time for 15 meters!

Everywhere in a humongous city like Tokyo, you see young boys and girls (8 to 13) taking the subway to school alone, hanging out in groups or playing in parks unsupervised. Older kids, 14 to 18, work in convenience stores or takeaway places, sometimes unsupervised by adults. Nobody kidnaps them, nobody assaults them, nobody robs them (try this in USA!).

And, no, in case you have turned on your filthy imagination, teenage girls are normally dressed, or sometimes weirdly dressed with multi-colored hair and funky

accessories, but not wearing micro-mini skirts and trying to seduce older men for money. If this does go no in Japan, it is an online, secret thing using only Japanese language, and I did not see any evidence of that at all in public places – I was not looking for it anyways! The Western media often writes about teenage girls behaving inappropriately in Japan-it is simply not true!

The punctuality of Japanese transportation that you may have heard of is all true. A train leaving at 2:13 pm will not leave at 2:14 pm. Even my long distance bus to Fujiyama from Tokyo went through highways and little towns and arrived on the dot after four hours.

Food :

Japanese food turned out to be surprisingly tasty! They use a small amount of spices, but skillfully enough so that the food becomes flavorful. This applies to all the beef and fish soups and entrees. I have eaten in Japan. And all the pickled and cooked veggies. Of course I liked the sushi and the tempura too.

What is even more remarkable is that the quality of food is the same everywhere. You can buy a chicken sandwich, or a lunch combo with soup and a piece of fish and pickled veggies from a roadside convenience store or from an expensive restaurant, they will taste the same. The restaurants only offer much more variety and ambiance at much higher prices. As soon as I discovered this I started having excellent meals in my hotel room that I bought from roadside convenience stores. A meal of four small sandwiches (egg salad, tuna, roast beef, and japan's unique strawberry and cream sandwich) and a small salad and a small pastry will be about 8 dollars and everything will be super fresh and taste great! A meal like that in a proper restaurant will cost at least twice as much.

The Japanese are very innovative about service in restaurants some of these are now being implemented in other countries.

You may have seen or visited the rotating wheel restaurants where freshly prepared food items are loaded on to the conveyor belt. You grab whatever you like. This lets you taste many small items.

Another way is only menus at the tables, your order reaches the kitchen online and delivered to you by the waiter. I have seen this in USA during recent years. Still another way is to look at the menu items at the entrance, order and pay at the machine at the gate and get a receipt. When you are inside, your receipt gets you the food you ordered already.

Then there are specialized places in entertainment districts. Apart from the ubiquitous Karaoke bar, there are Robot cafes, Anime cafes, Maid cafes, and so on. And finally cat and dog cafes where you can hang out with your favorite animals and have a latte at the same time. I tried the cat cafe, and loved it.

You can not finish a discussion of Japanese food without discussing their vending machines. Yes, they have scores

of beverages and snacks instead of only a handful in USA or Europe. You can also get prepackaged food and freshly cooked food in some machines that are supposedly very good. And machines are everywhere including at the street corners. I did not try the food, but I tried all kinds of weird drinks and liked some of them (my favorite : Pokari Sweat Water–yes sweat water!).

Health care coverage is a lot less comprehensive for working adults in recent years. On the other hand, for many seniors, health care coverage has been so excellent that many people of 100+ years continue to roam the streets, which results in some obvious social problems of depression, abandonment and loneliness.

Seniors :

Talking about senior citizens, I thought I was in decent physical shape for a man in my mid-sixties. The Japanese senior brigade put me into deep shame. I have never seen so many old folks with flat stomachs and ramrod straight posture, hiking, biking, exercising and playing sports (and apparently, having sex too) in their sixties, seventies and eighties! Some of them work in their mid-eighties, not for money, but to spend time!

I enclose two pics of my classmates in Rochester that I met after 38 years. The man with his daughter is Dr. Fukiharu, the guy with white hair is Dr. Kodaira, and the other guy is Dr. Takahashi.

একটি ভ্রমণের স্বর্ণালি অনুভূতি

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

সময়টা ছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি। তখন আমি বেশ ছোটো কিন্তু কোনোভাবে তখন থেকেই দেশ দেখার ও মানুষকে জানার একটা আগ্রহ অনুভব করতাম। এর আগে বেশ কিছু ভ্রমণ হয়েছে। তা একদিন কানাঘুষোয় শুনলাম এবার পুজোয় আমরা ভ্রমণে চলেছি গোয়া এবং মহারাষ্ট্রে। আর তাও সাত-দশ দিন নয় একেবারে একুশ দিনের ভ্রমণ। মনে স্বভাবতই শুরু হল চরকি নাচন। ট্রেনের কু-ঝিক-ঝিক আওয়াজের পাশে মা দুর্গার মুখ টাও তখন ফিকে হয়ে আসছে। আমার সব থেকে যেটা মজার ও অভিনব লাগছিল তা হল এই একুশ দিনই আমরা থাকব ট্রেনের কামরায়, কোনো হোটেলে থাকব না। যাক অনেক আশা, উদ্দীপনায় জাগা রাত কাটিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠলাম। সে এক বিচিত্র কামরা, সাধারণ কামরার সঙ্গে কোনো মিল নেই। দু-প্রান্তে দুটি বড়ো ঘর। এক-একটা ঘরে ১৫ জনের থাকার ব্যবস্থা আর মাঝে রান্নাঘর, কর্মচারীদের ঘর ও ট্যুর ম্যানেজারের ঘর। পরে জানলাম এগুলো রেল কোম্পানির বিশেষ কোচ যা ভ্রমণ সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয়। সেই কামরাই হল আমাদের একুশ দিনের বাড়ি।

একসঙ্গে একঘরে এতগুলো মানুষের থাকা, খাওয়া, শোয়া চিন্তাই করতে পারিনি কখনও। নিশ্চয়ই নানা অসুবিধা ছিল, যার সম্মুখীন বড়োরা আরও বেশি হয়েছেন হয়তো কিন্তু আমার শিশু-মনে মজা আর মাঝে মাঝে ঘটে যাওয়া চমকগুলোই মনের মধ্যে মিষ্টি স্বপ্নের মতো গাঁথা হয়ে থাকত। একুশ দিন ধরে বাইরের দু-পাশে পরিবর্তিত বিশ্বপ্রকৃতি আর ভেতরে তিরিশ জন ভ্রমণ পিপাসুদের আশা, আনন্দ, অসুবিধা, ঝগড়া সবই একসঙ্গে চলেছিল। যদিও নাম ছিল গোয়া - মহারাষ্ট্রের ট্রিপ, কিন্তু যাওয়া ও আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় এক দু-দিনের বিরতি হত ও দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনও হত। সেবার গয়া, সাঁচি, ভোপাল, জব্বলপুর, খাজুরাহো, অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ, মুম্বাই, গোয়া, পুনে অনেক জায়গাই তালিকায় ছিল। গন্তব্যে পৌঁছে আমাদের কামরাটাকে একটু দূরে একপাশে রেখে ট্রেন চলে যেত।

আমরা তখন ওই জায়গায় কয়েকদিন থাকতাম ওই কামরাতেই। আর ওই সময়টুকুতেই ওখানকার কাছাকাছি দর্শনীয় অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় মনের খুশিতে ঘুরে নিতাম। এ এক ভ্রমণের স্বর্ণালি অনুভূতি। তারপর এক সময় আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার ট্রেন আসত। আর সেই ট্রেনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কামরাটি জুড়ে দিয়ে শুরু হত নতুন জায়গায় ভ্রমণের অভিযান। এসমস্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ের সব বন্ধ দরজা-জানালা খুলে যেত। আর আমরা প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলতাম সখ্যতা। যে-সখ্যতা আমাদের নিয়ে যেত অপার এক সুন্দর অনুভূতির দিগন্ত বিস্তৃত মোহময় মোহানায়।

এরপর একবার হল কী, ট্রেন আমাদের ভুল লাইনে রেখে চলে গেল। তাকে ঠিক লাইনে আনার কোনো ইঞ্জিনও ভাড়া পাওয়া গেল না। ম্যানেজার কাকুর তো মাথায় হাত। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দলের পুরুষ সদস্যরা সবাই মিলে বগি ঠেলে ঠিক লাইনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সে কি আর সহজে নড়ে! তবে একবার নড়ে উঠে সে বেশ গড়গড় করেই চলেছিল। মনে আছে ১৪ নম্বর সিট-এর ভড়জেঠু একবারও হাত না-লাগিয়ে শুধু 'হেঁইয়ো' 'হেঁইয়ো' রব তুলেছিলেন। এই অদ্ভুত ভ্রমণ একদিন ফুরিয়ে এল। গল্প, হইচই, রেষারেষি মন কষাকষি পালার শেষ দিনে সবারই মুখ থমথমে দেখেছি। সেবার শুধু অনেক নতুন জায়গা, নতুন প্রকৃতির সঙ্গেই পরিচিত হইনি, অনেক অপরিচিত মানুষকে আপন বলে জেনেছি।

গল্প

নতুন পেশা

অপূর্ব কর্মকার

ভেবে ভেবে দীনু কুলকিনারা করে উঠতে পারছিল না। এই ভাইরাস সংক্রমণের অতিমারীতে আরও একটু ভালোভাবে যদি সে উপার্জন করতে পারত। দীনু মানে দীনবন্ধু হালুই। সে টানা সাইকেল রিকশা চালায়। বৃদ্ধা মা, বউ পরশমণি ও চার বছরের মেয়ে বুলিকে নিয়ে তার সংসার। সংসার চালাতে মাসে কমপক্ষে চার হাজার টাকা না-হলে চলে না। বউ পরশমণি প্রতিবেশী দু-বাড়িতে বাসন মাজে। এই আয়েতেই তাদের সংসারটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তেলিপুকুরের ধারে টালির চালায় দু-ঘরের মাথা গোঁজার বাসস্থানটা তার অবশ্য নিজের। নইলে কী যে হত! কিন্তু এই সংক্রমণের দুর্দিনে সাইকেল রিকশাতে আজকাল খুব বেশি আর সওয়ারি মেলে না। সওয়ারি নিয়ে তিন কিমি দূরে রেলওয়ে স্টেশন নতুবা আশপাশের গ্রামে যাওয়াটাই তার পেশা ছিল। নাহ, সাইকেল রিকশা সে আর চালাবে না। পরশও বলছিল যে সংক্রমণের জন্য পরের মাস থেকে তাকে নাকি পরের বাড়িতে কাজ করতে নাও যেতে হতে পারে। কী পেশায় নামবে সে? দীনু পুকুর সংলগ্ন সিমেন্টের বেদিতে বসে এঁকেবেঁকে হারিয়ে যাওয়া পিচ ঢালা রাস্তার দিকে তাকিয়ে এক মনে এসব কথাই ভাবছিল। সে ও পরশ হয়তো কোনো মতে কষ্টে-সৃষ্টে খেয়ে না-খেয়ে দিন গুজরান করতে পারে বটে, কিন্তু মা ও বুলিকে নিয়ে তার কপালের ভাঁজ আরও চওড়া হতে থাকে। হরেনের কথাটা তার মনে কয়েক দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। গত বছর তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কয়েক মাস হল গ্রামের হাটে পাইকারি ও খুচরো মাছ বিক্রি করছে। মাঝে মাঝে সে তার রিকশা করে কবরডাঙার বাজারে পাইকারি মাছ কিনতে যায় ও আসে। খুব ভোরে আড়ত থেকে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের মাছ এনে হাটে উপুড় করে ফেরি করে। সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তার মাছ বিক্রি শেষ করে লাভের টাকা আলাদা করে ব্যাগে সরিয়ে রাখে। তারপর মৌজ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশি মদের দোকানে রাতের বোতল কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কথাটা হরেনই কয়েকদিন আগে বলেছিল, 'তুমি তো কবরডাঙা থেকে মাছ কিনে পাড়ায় পাড়ায় তোমার সাইকেল রিকশা করে বিক্রি করতে পারো। আমার মতো লাভ না-হলেও মন্দ কিছু কম হবে না। তোমাকে তো পাইকারি দরে মাছ কিনতে দেবে না কবরডাঙার বাজারে। তবে সে ভার আমিই নেব। কাঁচামালের টাকারও ব্যবস্থা করে দেব। তুমি প্রথমে অল্প মাল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় একটু ঘুরে ঘুরে বিক্রি করবে।' এ কথা বলে সে তার হলুদ ছোপ ফেলা দাঁত বার করে ফিক ফিক হাসতে লাগল। কথা গুলো শুনে সে বুকে ভরসা পায়, এই ভেবে যে জগতে এখনো ভালো লোক আছে। বেদিতে বসে সে হরেনের প্রস্তাবে রাজি হবে বলে মন ঠিক করে নিল। আজ রাতেই পরশকে সে এ ব্যাপারটা জানাবে। মাকে সে কিছু জানাবে না, কেন-না মা তাকে ভীষণ স্নেহ করে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ফাঁক হলে সে পরশকে ব্যাপারটা সব খুলে বলল।

নিশুতি রাত। ঘরের জানালা দিয়ে চাঁদের খুব হালকা আলো ঘরে আসছে। পাশের ঘরে মা ও বুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। পরশের মুখটা দেখা যায় না। ঘরের এক কোণে ঘন অন্ধকারে সে বসেছিল। দীনু বুঝতে পারছিল না পরশ তার এই নতুন পেশাতে মত দেবে কিনা। সব শোনার পর সে চুপ করে থাকলে দীনু শুধোল, 'কিগো, তুমি কি রাজি নও?' কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর পরশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি কি হরেনের কথায় রাজি হলে, নাকি তুমি নিজেই ঠিক করলে যে এই পেশা শুরু করবে!' দীনু বলল, সে ও হরেন দুজনেই ঠিক করেছে। দীনুর মনে হল যে পরশ তার নিজের মুখে নিজের শাড়ির আঁচল জড়িয়ে বলল, 'একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না।' দীনু প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বলোতো? আমাদের তো এর জন্য ঘর থেকে প্রথমেই টাকা ঢালতে হচ্ছে না, শুধু পরিশ্রম আর তাও এক বেলার জন্য, বাকি দিনটা তো রইল, দরকার হলে ...। তাছাড়া আমাদের রোজের মাছও এই ফাঁকে জোগাড় হয়ে যাবে গো।' চাপা গলায় পরশ বলে উঠল, 'তোমায় একটা কথা বলা হয়নি, হরেন লোকটা ভালো নয়। তোমার অবর্তমানে আমি যে কয়েক বার হরেনের ঠেকে মাছ কিনতে গেছি, ততবার কিছু-না কিছু অস্বাভাবিক লেগেছে। বলে কি তুমি পরে ফাঁকা হলে এসো।' দীনু নড়েচড়ে বসে জিগ্যেস করল, 'কি হল, কেন গো? তাতে কি হয়েছে?' পরশ বলে ওঠে, 'ওর চোখের চাহনিটা কেমন যেন, যেন সব কিছু আমার খুঁটিয়ে গিলতে চায়, গোগ্রাসে আমাকে মাপতে চায়।' টানটান হয়ে থাকা দীনুকে আরও বলে, 'জানো কি, ও আমাকে অর্ধেক দামে মাছ দিতে চায়, এমনকী কোনো সময় মাছের দামও নিতে চায় না। লজ্জার কথা মাগো, কি বলে জানো? দরকার পড়লে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ো। শুধতে হবে না।' দীনুর সম্বিৎ ফিরে আসে, সে বলে, 'আমার তো এ

রকম কোনোদিন মনে হয়নি, তুমি মনে হয় ভুল করছ। তুমি টাকা নিলে হয়তো মনে হয় আমাকেই শোধ করতে হত।' পরশ একটু চুপ করে থেকে বলে চলে, 'সিগারেট-বিড়ি-মদের ওর খুব নেশা। লখাইয়ের মাও বলছিল যে তার সঙ্গেও সে নাকি একই কথা বলেছে।' দীনু চুপ করে থাকে। পরশ বলে, 'শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।' এর সপ্তাহ খানেক পরে দীনু মাছ ব্যাবসা শুরু করল। হরেনের কথামতো ভালোই লাভ হতে থাকে। তার সংসারে অভাব-অনটন আগের থেকে অনেকটা দূর হয়েছে। পরশও দীনুর নতুন পেশার বিষয়ে কোনো আপত্তি করে না। দীনু এখন সিগারেট খেতে শিখেছে। সে শধু বলে, 'বেশি খে য়ো না। দয়া করে মদ তুমি ছোঁবে না, প্রতিজ্ঞা করো।' দীনু চুপ করে থাকে। আরও প্রায় ছ-মাস এভাবে পার হল এতদিনে দীনুর মাছের ব্যাবসা আরও জমেছে। বুলিকে পরের বছর স্কুলে ভরতি করাতে পারবে। পরশও তাই চায়। সেটাই করবে দীনু।

সেদিন দুর্গা মহাষ্টমী। চারদিকে খুব একটা পুজোর ঘনঘটা না-থাকলেও মায়ের পুজো হচ্ছে। অনেক রাত হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় সন্ধিপুজোর পর সেই যে, 'এই আসছি' বলে দীনু বাড়ির বাইরে বেরোল, আর তার কোনো পাত্তা নেই। পরশ আনচান হয়ে ঘরবার করতে থাকে। বুলি 'বাবা, বাবা' কোথায়? বলে কাঁদছিল। পরশ পাড়ার কয়েকজনকে দীনুর হদিস জানতে চাইলে কেউ বলতে পারে না। হঠাৎই পরশ ঘরের ভেতর থেকে বাইরে থাকা দীনুর হাঁক শুনতে পায়, 'কিরে কোথায় আছিস? শুনতে পাচ্ছিস না? শালী কোথাকার! মরেছিস নাকি।' চারদিকের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে যায়। ত্রস্ত পায়ে দরজায় দাঁড়িয়ে এক অজানা ভয়ে সে দীনুকে দেখে। দীনু টলছে। তার পরনের নতুন সাদা পাঞ্জাবিতে ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়ার ছাপ। নিঃশ্বাসে তার সিগারেট ও মদের তীব্র গন্ধ। মুখে তার দুর্গন্ধ, এ গন্ধ সে আগেও হরেনের কথা বলার সময় পেয়েছে। দীনুর চোখগুলো বুজে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে। পরশ তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে তক্তপোশে শুইয়ে দেয়। দীনু চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকে। তার গাল দিয়ে মদের গাঁজা বেরিয়ে আসে। পরশ মুছিয়ে দেয়। নিজের বুকে একটা চাপা গোঙানি অনুভব করে। কী যেন এক অজানা, অভাবিত দুর্যোগের আশঙ্কায় সে গুমরে ওঠে। পাশের ঘর থেকে মা বলে, 'বউমা, ওকে কিছু অন্তত খাইয়ে দিয়ো। বুলি ঘুমিয়ে পড়ছে।' পরশ কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। তার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে। তার চোখ দিয়ে চাপা কান্না বেরিয়ে আসে। দেয়ালের পেরেকে লটকে থাকা লক্ষ্মী ঠাকুরের ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, 'মাগো, আমাদের তুমি এভাবে সংক্রামিত করলে! কী পাপ করেছি মা? কোথায় দাঁড়াব মাগো এবার? মান-সম্মান, কষ্টার্জিত অর্থ যা-কিছু ছিল সবই আক্রান্ত হয়েছে, মা। এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যেয়ো না, আমাদের বাঁচাও, উদ্ধার করো, কৃপা করো, মা।' দীনু পাশ ফিরে শোয়। পরশের আর্তি তার কানে যায় না। পরশ দীনুর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। বাইরে পিছনের বাঁশবনে হাওয়া শনশন বয়ে চলে।

ধূসর বসন্ত
সুস্মিতা ত্রিপাঠী (ব্যানার্জী)

মরা মাছের মতো সাদা দু-চোখ মেলে চৈতি 'প্রতীক্ষা'-র বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। প্রতীক্ষা চৈতিদের বাড়ির নাম। এই বাড়ি বাবার তৈরি, অনেক শখের বাড়ি। বোবা চাউনি দিয়ে চৈতি দেখে পলাশ গাছটা রাধাচূড়ার কানে কানে কী যেন বলছে। আর রাধাচূড়া নববধূর মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে যাচ্ছে। সে জানালার বাইরে ওই গাছ দুটোর মধ্যে কী যেন খোঁজে। হঠাৎ রাধাচূড়া গাছের ডালে বসে থাকা কোকিলটা গেয়ে উঠল বসন্তের গান। যদিও সেই গান তার কানে প্রবেশ করল না। তার মনকে আজকাল কোনো রঙই আর রঙিন করতে পারে না। মনের ভেতর এখন শুধু ধূসর ফ্যাকাশে শূন্যতার রঙ।

কিন্তু গত বছরও তো কত রঙ-এর আবিরে চৈতি মেতে উঠেছিল বসন্তের সঙ্গে। আসলে তার জীবনসাথির নামও ছিল বসন্ত। তখনও ওই ভিনদেশি মারণ রোগটা ভারতে স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করতে পারেনি। চৈতি আর বসন্ত দোলের দিন কত রঙের আবিরে নিজেদের সাজিয়েছিল। ভালোবাসার রং মেখে দুটো মন ভেসে গিয়েছিল প্রেমের সমুদ্রে। আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতো চৈতি আর বসন্তের বিয়েটাও হয়েছিল সম্বন্ধ করে। অন্য মেয়েদের মতো চৈতিও সংসার সুখের স্বপ্ন কাজলে নিজের চোখ দুটোকে সাজিয়ে বিয়ে নামক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল বসন্তের সঙ্গে। হাসি-আনন্দ-খুনসুটি, মান- অভিমান সবকিছু নিয়ে সে তার অনভ্যস্ত হাতে সংসারটা একটু একটু করে সাজিয়ে তুলছিল।

হঠাৎ গত বছর পুজোর পর থেকে এক অজানা মারণ রোগ থাবা বসাল বিশ্বজুড়ে। ধীরে ধীরে ভারতের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল সে। সবার মতো চৈতিও খুব ভয় পেল। চৈতির বাবা-মা তখন ভেলোরে চিকিৎসার জন্য গেছেন। হঠাৎই একদিন মার্কেটিং করে ফেরার পথে তার সঙ্গে তাদের বোলপুরের বাড়ির পাশের বাড়ির মেয়ে ছোটোবেলার বন্ধু বৃষ্টির দেখা। বৃষ্টি বিশ্বভারতী থেকে দর্শনে এমএ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-তে গবেষণার জন্য থাকার জায়গা খুঁজছে। চৈতি বৃষ্টিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। বৃষ্টির মধ্যে চৈতি বোলপুরে তার নিজের বাড়ির আপনজনের গন্ধ খুঁজে পেল। বসন্ত অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর একঘেয়ে একাকিত্ব জীবন থেকে মুক্তি পেতে চৈতি তখন নাছোড়বান্দা বৃষ্টিকে তাদের সঙ্গে রাখার জন্য। প্রথমে বৃষ্টি একেবারে রাজি না-হলেও সপ্তাহখানেক থাকবে বলে রাজি হয় চৈতির একান্ত অনুরোধে। বসন্তেরও কোনো আপত্তি ছিল না। প্রথম দু-দিন বেশ ভালোই কাটল ওদের। তখন মার্চ মাসের মাঝামাঝি। বোলপুর থেকে খবর এল চৈতির বাবা-মা ভেলোর থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু চৈতির মায়ের ভীষণ জ্বর। চৈতির মনটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তবে কি ওই মারণ রোগটা থাবা বসাল চৈতির মায়ের শরীরে? বসন্ত তখন অফিসে। একটুও দেরি না- করে বসন্তকে ফোন করে চৈতি রওনা দিল বোলপুরের পথে। সঙ্গে বৃষ্টি যেতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে খবর দেবে বলে সে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বসন্ত বলেছিল দু-দিনের মধ্যে সেও যাবে।

কিন্তু বসন্ত আর যেতে পারেনি। চৈতি বোলপুরে যাওয়ার একদিনের মধ্যে সরকারিভাবে লকডাউন ঘোষিত হল সারা দেশ ব্যাপী। একদিনের মধ্যে সবকিছু যেন থমকে গেল। ওদিকে চৈতি আর ওর বাবা তখন মায়ের চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন হাসপাতালের দরজায় কড়া নাড়ছে। ওই মারণ রোগটা তখন চৈতির মায়ের শরীরের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। শরীরের মধ্যে অসম লড়াই শুরু হল, যে-লড়াই জেতার ক্ষমতা চৈতির মায়ের ছিল না। রোগটা জিতে গেল। রোগটা এতটাই ছোঁয়াচে যে শেষ দেখাও দেখতে পেল না চৈতিরা। চৈতির জীবন এক লহমায় বদলে গেল। তার প্রথম হাঁটতে শেখা যার হাত ধরে, রাতে ঘুমোতে যাওয়া যাকে জড়িয়ে ধরে, নার্সারি স্কুল থেকে এতদিনে ঘটে যাওয়া জীবনের অনেক ঘটনা বন্ধুর মতো শেয়ার করত যে মানুষটার সঙ্গে সেই মানুষটাকে প্লাস্টিকে মুড়ে ওরা নিয়ে চলে গেল। চৈতির বাবাও ঘটনার আকস্মিকতায় খুব ভেঙে পড়লেন। চারদিকেই শুধু শূন্যতা। কান্না যেন গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে। সে কী অব্যক্ত যন্ত্রণা! সেই সময় বৃষ্টির জ্যাঠতুতো দাদা আবির চৈতিদের সমব্যথী হয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছোটোবেলা থেকে এক পাড়ায় বেড়ে ওঠা দুজন মনে মনে একে অপরকে পছন্দ করলেও কেউ কাউকে কোনোদিন বলে উঠতেই পারেনি। তারপর তো চৈতিরও বিয়ে হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন পর লকডাউনের কঠোর নিয়ম তখন কিছুটা শিথিল হয়েছে। চৈতি অনেক কষ্টে বোলপুর থেকে ফিরতে পেরেছে কলকাতায়। এর মধ্যে বসন্ত একবারও বোলপুরে যেতে পারেনি। কিন্তু এ কোন্ সংসারে এল চৈতি? এ তো তার নিজের সাজানো সংসার নয়। যে চৈতি হাওয়ায় বসন্ত হয়ে উঠত উদ্দাম

উত্তাল সেই হাওয়ায় বসন্তের এখন দম বন্ধ হয়ে আসে। বসন্তের এখন বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে। যে বৃষ্টি অনেক অনুরোধে এক সপ্তাহের জন্য চৈতির সংসারে থাকতে রাজি হয়েছিল সেই সংসার এখন বৃষ্টির চৈতি এখন অতিথি ছাড়া আর কিছুই নয়। সব বুঝেও সে চুপ করে থাকে। মারণ রোগটা শুধু চৈতির মাকে নয়; ওর সংসারটাকেও কেড়ে নিয়েছে। চৈতি তা বুঝতে পারে। তারপর যেদিন বসন্ত বলেছিল চৈতির সঙ্গে সে আর থাকতে পারছে না সেদিনই একটাও কথা না-বলে চৈতি বোলপুরে ফিরে এসেছিল।

তারপর থেকে সে কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। চোখ থেকে একফোঁটা জলও আর পড়েনি। আবির অনেক চেষ্টা করেছিল চৈতিকে স্বাভাবিক করতে। কিন্তু সে আবিরকে সবসময় এড়িয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য প্রতিদিনের মতো সোনালি আভা ছড়িয়ে বিদায় নিতে প্রস্তুত। চৈতি এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

চৈতির বাবা চৈতির পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সে দেখতেই পায় না। সে শুধু ধূসর চোখে কী যেন খোঁজে। রাধাচূড়া গাছের ডালে বসা কোকিলটা এতক্ষণ ডাকতে ডাকতে অদ্ভুতভাবে চুপ করে গেছে। শেষ বিকেলের নরম আলোর আভা চৈতির মুখে এসে পড়েছে। আবিরদের বাড়ির মিউজিক সিস্টেমে এখন গান বাজছে।

‘ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে, আমার নামটি লিখো তোমার মনেরও মন্দিরে।’ চৈতি অন্ধকারেও পলাশ আর রাধাচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে।

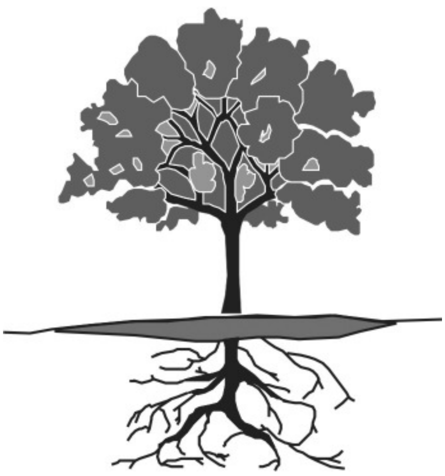

ওরা

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

‘কী খাবেন? হাঁস, না মুরগি?’ জিজ্ঞাসা করলেন নাজমলদা।

আমতা আমতা করল দিবাকর। কী বলবে উত্তরে? আসলে খেতেই যে ইচ্ছে করছে না কিছু। অমৃত দিলেও না। তবু বলতেই হবে কিছু একটা যা খুশি।

না না, আপনি যেটা বলবেন।

তবে হাঁসই হোক।

আমিনা খুশি হয়ে হাসল। বলল, তবে কাটি গে।
নাজমলদা বললেন, ‘তাড়াতাড়ি করিস। উনি আবার বেরোবেন। অনেক কাজ আছে।’

দিবাকরের মাথায় তখন চিন্তার রাশি, স্কুলে গিয়ে আজই কাজটা সেরে নিতে না-পারলে অহেতুক আরও একদিন এসে হত্যে দিতে হবে। হেডস্যারও তেমনি নিষ্কর্মা, তবু কানাইবাবু ভরসা দিয়েছেন, এই যা।

নাজমলদা বললেন, কলকাতা ফিরতেই হবে আজ? না-গেলে নয়? একদিন বেড়ালেন না-হয়। অনেক দিন বাদে এলেন।

আঁতকে উঠল দিবাকর। না না থাকার উপায়ই নেই আজ। ডকুমেন্টসগুলো যত শ্রীঘ্র সম্ভব নিয়ে গিয়ে ডি আই অফিসে জমা দিতে হবে। নইলে অসুবিধায় পড়তে পারি। কালই ভাবছি সেখানে ছুটব। আপনি চলুন একদিন। সৌম্য অনেক বড়ো হয়ে গেছে। সেই তো গেলেন। আলপনাও বলছিল আপনাদের কথা।

নিশ্চয়ই যাব। একটু সেরে উঠি। এখন তো ধান ওঠার সময়। ঘরবার হওয়া যাবে না এক দণ্ডের জন্যে। আর ক-টা দিন যাক।

আমিনার বিয়ের ঠিক হল কোথাও? বলছিলেন যে?

প্রায়। বলে উঠে দাঁড়ালেন নাজমলদা। ওরা তো আরও একবার আসবে বলল।

কোথাকার?

পাশেই, দোয়াবগঞ্জে। উত্তরের দিকে আঙুল দেখালেন নাজমলদা। ছেলেটা ভালো পয়সাকড়িও আছে। খাওয়া-পরার অভাব হবে না কোনোদিন।

কী করে?

সোনা-রুপোর কাজ আপাতত রাজস্থানে আছে। বাড়ির পাশেও দোকান কিনেছে একটি। কিছুদিনের মধ্যে এখানে এসেই সাজিয়ে-গুছিয়ে বসার ইচ্ছে।

দিবাকর তড়িঘড়ি স্নান সেরে এল। কিন্তু খেতে বসে বেজায় অস্বস্তিতে পড়ল। মুসলমান বাড়ির রান্না কেমন করে রোচে মুখে? জীবনে কোথাও খায়নি যে এমন।

নাজমলদা বললেন, আরও একটু মাংস নিন?

প্রায় দু-হাতে বারণ করল দিবাকর না না, আর না। এই যথেষ্ট।

আমিনা বলল, না স্যার। আরও একটু দিই? কতটুকুই বা খেলেন। একটু ভাত?

না সোনা, আর না। বিনীত সুরে বললেন দিবাকর।

খুব অল্প ভাত খেয়েছে দিবাকর। তবু ভেতরকার অস্বস্তিটা যাচ্ছে না কিছুতে। কেমন একটা বমি ভাব সারাক্ষণ অস্থির করে তুলল তাকে। ট্রেনে উঠেই গলগল করে বমি করে দিল ও। খানিক অসুস্থতাও বোধ করছিল। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

অনেকক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরল ওর।

অল্প বয়েসি ছেলেটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বলল, কেমন বোধ করছেন এখন? একটু ভালো তো?

গা বমি ভাবটা গেছে?

দিবাকর মাথা নাড়ল।

হঠাৎই এমন অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন? আপনার আগের কোনো রোগ-টোগ ...

মাথা নাড়ল দিবাকর। না, আগে কোনোদিনও হয়নি।

তবে, এমন হল আজ?

দুশ্চিন্তায় মাথা দোলাল দিবাকর উত্তর থেকে দক্ষিণে একবার। জানি না।

খাওয়াদাওয়ার গোলমাল হয়েছে কিছু? গ্যাস-অম্বল? এভাবে বমি করলেন?

ভুরু কুঁচকে তাকালেন দিবাকর। কী বলবেন উত্তরে?

ততক্ষণে ট্রেন হাওড়া পৌঁছোল।

এবারে নামতে হবে যে। ছেলেটা বলল। যেতে পারবেন একা? কোথায় যাবেন?

বেহালা।

আহ্লাদিত হল ছেলেটি। বেহালা। তবে তো একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। চলুন, আমিও বেহালা।

বাসে উঠে আরও একবার বমি করল দিবাকর। ভাগ্যিস জানলার ধারে বসেছিল। ছেলেটিই ওর ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে দিল। মুখ ধুয়ে, ঢকঢক করে জল খেল দিবাকর।

বাস থেকে নেমে বলল, আমায় একটু এগিয়ে দেবে ভাই? মানে বাড়ি অবধি। শরীরটা ঠিক লাগছে না এখনও। কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

অব্‌কোর্স। কেন নয়? চলুন কোন্‌দিকে যাবেন?

স্বামীজি সড়ক। চৌরাস্তা থেকে অটো। টুয়ার্ডস টালিগঞ্জ।

ও, ইয়েস। আর কয়েকটা স্টপেজ। আপনি একটু চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন।

বাড়িতে এসে বসল না ছেলেটি। তবু দিবাকর জোর করল। একটু বোসো না ভাই। একটু জল-মিষ্টি খাও, না-হলে খারাপ লাগবে আমার। এত উপকার করলে।

ছেলেটি মাথা নাড়ে। আরে না না, এ কিছু নয়। আপনার শরীর ভালো নয়। অথচ রাস্তায় একা। এটুকু তো করতেই হয়।

তুমি কোথায় থাকো ভাই? তোমার নাম?

জলের গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিবাকরের দিকে হেসে তাকাল ছেলেটি। আমি করিম ইসলাম। বাড়ি আরামবাগে। তারাতলায় আমার অফিস। বাই প্রফেশন একজন ইঞ্জিনিয়ার।

আরও একবার গা-গুলিয়ে উঠল দিবাকরের। পরক্ষণেই সামলে নিল। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল কৃত্রিম হাসল। বলল, তোমার ভালো হোক বাবা। মঙ্গল হোক।

গলির মোড়ে ছেলেটি অদৃশ্য না-হয়ে যাওয়া অবধি ঠায় দাঁড়িয়েছিল দিবাকর। মাঝে-মধ্যে হাত নাড়ছিল। আর বলছিল, আরও একবার এসো ভাই। বাড়ি চিনে গেলে। ...

ঘরে ঢুকে শরীরটা তুলনায় ফ্রেস লাগল দিবাকরের। মনটাও। না, গা বমি ভাবটা আর একদমই নেই। থাকার কথাও নয়। মনে মনে ভাবল, বস্তুত নাজমলদা কত ভালোবেসে খ াইয়েছেন তাকে। ক-দিন আগেরও তার প্রিয় ছাত্রী আমিনা নিজের হাতে রান্না করেছে। 'মুসলমান' শব্দটির আড়ালে 'ভালোবাসা' বস্তুটাই যে চাপা পড়ে গিয়েছিল এতদিন। সারা রাস্তায় তাই না এত কষ্ট পেতে হল তাকে।

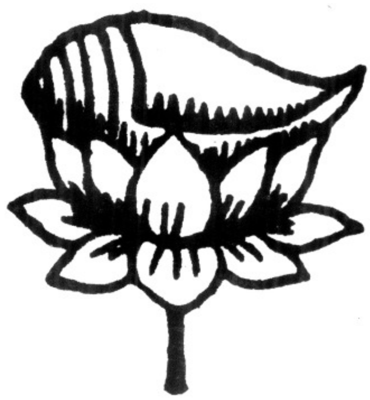

প্রশ্রয়

জয়ন্ত সুকুল

মহিতোষ ব্যানার্জী একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। শিশির বাগান তল্লাটে ওর বেশ নাম ডাক আছে। ভূগোল বিষয়ের নামি শিক্ষক হওয়ার সুবাদে এলাকার ছাত্ররাও বেশ উপকৃত হন স্যারের কাছে পড়ে। ছাত্ররা তাঁকে অবশ্য কমলালেবু স্যার বলে ডাকে। এর কারণ একটা কমলালেবুর অর্ধেকটা খোসা ছাড়ালে যেমনটা হয় স্যারের টাকটা অনেকটাই সেরকম। মাথার চারদিকে কিছু চুল থাকলেও চাঁদিটা একেবারে ফাঁকা, অবসর নিলেও স্যারের ধ্যানজ্ঞান শুধু মাত্র ভূগোল বিষয়ের চর্চা করা। সমাজে যেন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য চর্চার ইত্যাদি আর কোনো বিষয় নেই। যেখানেই যান মহীতোষ স্যার কেবল ভূগোল বিষয়ক গল্পই বলেন।

আসলে প্রতিটি মানুষ হয়ত স্যারের মতো। আমরা আসলে খেয়াল করি না। যে মানুষ যে ক্ষেত্রে কাজ করেছেন সারাজীবন সে সুযোগ পেলে সেই ক্ষেত্রের কথাই বেশি বলেন সব সময়। যেমন রেলকর্মী রেল বিষয়ক, ব্যাংককর্মী ব্যাংক বিষয়ক, সামরিক কর্মী যুদ্ধ বিষয়ক, বিমানকর্মী উড়ান বিষয়ক, স্বাস্থ্য কর্মী স্বাস্থ্য বিষয়ক, রাজনীতিবিদ রাজনীতি বিষয়ক ইত্যাদি এরকম আর কী। মহীতোষ স্যারও সেরকম এই বয়সেও অস্ট্রেলিয়ার মারে ডার্লিং নদী থেকে ইটালির ভিসুভিয়াস, কিংবা ইউরোপের আল্পস পর্বত থেকে দক্ষিণ আমেরিকার লা-প্লাটা নদী পর্যন্ত অবাধে বিচরণ করেন। পাড়ার লেখাপড়া করা ছেলেমেয়েরা তাই স্যারের নাগাল একটু এড়িয়ে যায়। কী জানি বাবা হয়ত বা এখুনি জিজ্ঞাসা করে বসবেন মঙ্গোলিয়া বা কলম্বিয়ার রাজধানীর নাম, নয়তো বা নায়াগ্রা জলপ্রপাত কিংবা জার্মানির শিল্পাঞ্চলের বিষয়ে! তা না-হলে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী অথবা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর নাম বললে তবেই নিষ্কৃতি মিলবে।

মহীতোষবাবু দয়ালু ও পরোপকারী মানুষও বটে। পাড়ার মানুষের আপদ-বিপদে যতটুকু সাহায্য করা ওঁর পক্ষে সম্ভব, করে থাকেন। সবার খোঁজখবরও রাখেন, এজন্য সবাই স্যারকে ভালোবাসেন। বোশেখ মাসের দারুণ দাবদাহ চলছে। দারুন অগি্নবাণে প্রাণটা একেবারে হাসফাস করছে। আজ বিকেলে মহীতোষ স্যারের বিদ্যালয় থেকে দুজন ছাত্র এসে একটা আমন্ত্রণ- পত্র দিয়ে গেল। বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষ্যে এই আমন্ত্রণ। বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে স্যার ভীষণ খুশি হলেন। অবসর গ্রহণের পর দু-এক বছর স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগদান করার আমন্ত্রণ পেলেও পরে আর কেউ খোঁজ রাখেনি। দু-চার জন পুরোনো বন্ধুরা অবশ্য নিয়মিত খোঁজখবর নেন। একবার কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নিলে সেখানে তার আর আগের মর্যাদা থাকে না। এটা স্যার বিলক্ষণ জানেন। তাই এতদিন পর আবার বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে এত গরমে কষ্ট পেলেও স্যারের মনটা আনন্দে ভরে গেল। বিদ্যালয় জীবনের কতশত ভালোমন্দ স্মৃতি মনে পড়ে গেল মুহূর্তে।

গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতো রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের তাঁরই লেখা গান 'আলোকেরই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও ... ধূলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। এরপর বিদ্যালয়ের নবাগত প্রধানশিক্ষক রমেশবাবু স্বাগত ভাষণ শুরু করলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নবীন-প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত শিক্ষক মহাশয়, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানিয়ে রমেশবাবু বললেন, তিনি এই বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র জীবনের একটি কাহিনি বলবেন এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন।

সভাস্থলে উপস্থিত মানুষজন সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রধানশিক্ষকের জীবনের ঘটনা শোনার জন্য।

প্রধানশিক্ষক রমেশ খাসনবীশ মহাশয় শোনাতে শুরু করলেন তাঁর বিদ্যালয় জীবনের কাহিনি।

স্কুলে প্রতিদিনের মতো প্রার্থনাসভা শেষ হওয়ার পর যথারীতি ছাত্ররা নিজ নিজ ক্লাসে চলে যায়। ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়ে এবং সময়মতো ক্লাস শুরু হয়। ঘটনার দিন ক্লাস সেভেনের 'এ' সেকশনের প্রথম পিরিয়ডের ভূগোলের ক্লাস ছিল। ক্লাসে ভূগোলের শিক্ষকমশাই মহীতোষবাবু ঢুকতেই ক্লাসের ছাত্র বিকাশ তলাপাত্র উঠে দাঁড়িয়ে স্যারকে নালিশ জানাল তার পেনটি ব্যাগ থেকে চুরি হয়ে গেছে। ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কে এ কাজ করেছে স্যার জানতে চাইলেন। তারা সবাই জানাল তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেনি। পেন হারানোর বেদনায় বিকাশ কাঁদতে থাকল। শিক্ষকমশাই ছাত্রদের আশ্বস্ত করলেন ক্লাস শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তিনি দেখবেন এবং অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন যে পেনটি বিকাশের ব্যাগ থেকে কে চুরি করেছে।

স্যারের একথা শুনে ছাত্ররা যে-যার বেঞ্চে নিজের বসার জায়গায় বসে পড়ল। সারা ক্লাস স্তব্ধ হয়ে গেল। সব মুখমণ্ডলের

চেহারা আতঙ্কে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। একে তো ভয়ংকর রাগী মহীতোষ স্যার তায় আবার পেন চুরি। যে এ কাজ করেছে একবার ধরা পড়লে স্যার নিশ্চই গোবেড়েন করবেন। এই রকম পরিস্থিতিতে স্যার পড়াতে শুরু করলেন ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বিষয়ে। কিন্তু সেদিকে সবার বিশেষ মনোযোগ না-থাকলেও বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হচ্ছে। তিনি একবার বোর্ডে লেখেন আর পরক্ষণে পিছন ফিরে সেটাই বুঝিয়ে দেন। এরকম ভাবে স্যার যখন বোর্ডে কিছু লিখছিলেন সে সময় পিছন ফিরে বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলেন তৃতীয় বেঞ্চে বসা রমেশ খাসনবীশ নামের ছেলেটি খুব সন্তর্পণে তার নিজের ব্যাগ থেকে লাল রঙের ভারী সুন্দর একটি পেন বের করে তারই পাশে বসা বিকাশ তলাপাত্রের ব্যাগের মধ্যে চুপিসারে ঢুকিয়ে দিল। রমেশ পেনটি চুরি করেছিল। কিন্তু পড়াশোনায় সে খুবই মেধাবী। ক্লাসে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র। আর যার পেন সেই বিকাশ তলাপাত্র মেধাবী না-হলেও খুব ভালো গান ও আবৃত্তি করতে পারত। স্যারের কাছে দুজনেই খুবই স্নেহেরপাত্র। মহীতোষবাবু হঠাৎ ছাত্রদের সামনে ফিরে বোঝাতে গিয়ে রমেশের এই কাজটি চোখে পড়ে যায়। স্যার যে দেখতে পেয়েছেন তা কেবলমাত্র রমেশ এটা বুঝতে পারল। আসন্ন মহাবিপদের আতঙ্কে রমেশের চোখমুখ প্রায় শুকিয়ে গেল। এরপর সে সারাক্ষণ মাথা নিচু করে থাকল। মহিতোষবাবুও ঘটনাটি দেখেও না-দেখার ভান করলেন। ক্লাস শেষ হলে তিনি যথারীতি চলেও গেলেন।

এদিকে রমেশের মানসিক চঞ্চলতা বেড়ে গেল। সে ভাবল এরপর বিষয়টি হয়ত প্রধানশিক্ষকের কানে যাবে। তিনি বাবা-মাকে ডাকবেন। বিদ্যালয় থেকে হয়ত তাকে তাড়িয়েও দেওয়া হতে পারে। এরকম মানসিক অস্থিরতার দোলাচলে রমেশের মন উথালপাতাল হতে থাকে। এরপর থেকে ভয়ে রমেশ দু-দিন স্কুলে আসেনি। তারপর কেটে যায় দিন। রমেশ স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ভরতি হয় কলেজে আর সময়ের নিয়মে ভূগোলের শিক্ষকমশাই একসময় অবসর নেন শিক্ষকতার জীবন থেকে।

প্রধানশিক্ষক বলতে থাকেন এরপর তিনি পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। অবশেষে কয়েকটি বিদ্যালয়ে চাকরি করার পর বর্তমানে তিনি তাঁর নিজের পড়াশোনা করা বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক হয়ে এসেছেন। এটি তাঁর কাছে গৌরবের বিষয়। কিন্তু তাঁর মনে আজীবন একটি প্রশ্ন কাঁটার মতো বিঁধে আছে যে, ছাত্রদরদি শিক্ষক হিসেবে মাননীয় মহীতোষবাবু ছাত্র অন্যায় করছে দেখেও কেন কিছু বলেননি। তিনি কেন তাকে শাস্তি দেননি। আমি সেই প্রশ্নের উত্তর ও সত্যটাকে জানার জন্য এই সভায় আপনাদের আহ্বান জানিয়েছি। এই বলে তিনি ভুগোলের শিক্ষক মহীতোষবাবুর কাছে মাইকটা এগিয়ে দিলেন।

মহীতোষ স্যার ধীরে ধীরে মাইকের সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন আপনারা ঠিকই শুনেছেন। রমেশের পেন-চুরি করার ঘটনাটা আমি জানতাম। জানার পরে কেন আমি তাকে সাবধান করিনি বা সবার সামনে সাজা দিইনি। সেই কথা আজ আমি বলব।

তিনি বললেন ছাত্রের অন্যায় দেখে আমি তাকে শাস্তি দিইনি। এটা আমারও অপরাধ, কারণ যে অন্যায় করে আর সেই অন্যায় যে সহ্য করে দুজনেই সমান অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তার সেই অন্যায় কাজকে কেন সে সময় প্রশ্রয় দিয়েছিলাম তার কারণ হল, সে সময় ঘটনাটি প্রকাশ হলে কোমলমতি রমেশের সম্মান যেমন যেত তেমনি সে ক্লাসের মধ্যে অন্য ছেলেদের কাছে ছোটো ও চোর বলে প্রতিপন্ন হত। আর বেশি জানাজানি হলে কৈশোর বয়সের রমেশের জীবনে নেমে আসত অসম্মানের বেদনা। লোকলজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেতে অতি আবেগ প্রবণ হয়ে ওই কৈশোর বয়সে হয়ত রমেশ এমন কিছু করত যা তার জীবনে অন্ধকার নিয়ে আসতে পারত। আর ক্লাসের প্রথম দিকের ভালো ছাত্ররা অন্যদের থেকে বেশি আবেগ প্রবণ হয়। শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি দুষ্ট বা ফাঁকিবাজ ছেলেদের বকলে, মারলে, বা ক্লাস থেকে বের করে দিলে তাদের প্রতিক্রিয়া কম হয়। তারা একইরকম থাকে। কিন্তু মেধাবীদের সামান্য ধমক দিলে চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। তারা বিষণ্ণ বদনে মাথা নিচু করে থাকে। আর তাই অপেক্ষায় ছিলাম রমেশ যদি দ্বিতীয় বার এরকম অন্যায় করে তাহলে তাকে বকবেন বা সাজা দেবেন। কিন্তু এর পর থেকে সারা স্কুলজীবনে রমেশের আর কোনো অন্যায় তিনি দেখেননি।

রমেশের এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং সাবধান না-করার যন্ত্রণাও আমাকে সারাজীবন কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম পরবর্তী জীবনে রমেশ খাসনবীশ একজন সফল শিক্ষক ও সমাজসেবী। গ্রাম ও শহর ছাড়িয়ে তার নাম বহু দূরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ জীবনে রমেশ হয়ে উঠেছে পরোপকারী, নিরহংকারী, ও গরিব মানুষের দুঃখে কাতর ও সমাজমনস্ক এক বিরল গুণসম্পন্ন মানুষ। তখন আমার আনন্দে মন ভরে গিয়েছিল। রমেশের কাজের প্রশংসা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যক্রমে ও আজ আমার স্কুলের প্রধানশিক্ষক, ওর সঙ্গে আমার দেখা করার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। আর সেই সুযোগ ও নিজেই আমাকে করে দিয়েছে। তাই এই জীবন সায়াহ্নে এসে আশীর্বাদ করি রমেশ আরও বড়ো হোক।

এরপর প্রধানশিক্ষক রমেশবাবু তাঁর প্রিয় মহীতোষ স্যারের কাছে গিয়ে বলেন, 'স্যার ছাত্রজীবনে আপনি আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে আলোর পৃথিবীতে এগিয়ে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ-চিরঋণী আপনার কাছে।'

মহীতোষবাবু উত্তরে বললেন, তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বেদনা নিয়ে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। সেদিন কিছু বলতে পারিনি তুমি অসম্মানিত ও বন্ধুদের কাছে চোর পরিচয়ে ঘৃণার পাত্র হবে বলে। কিন্তু আজ আর আমার কোনো রাগ নেই তোমার ওপর। আজ আমি সুখী, গর্বিত। এই ঘটনা এতদিন মনে রেখে তুমি জীবনে সৎ, ও সত্য পথে আছ বলে। কিন্তু যখন দেখি সমাজে কতজন কত বড়ো বড়ো অন্যায় ও প্রতারণা করছে বার বার। তাদের শাস্তি হচ্ছে না। শাস্তি দেওয়ারও যেন কেউ নেই, তখন কষ্ট হয়।

তাই মানুষের জীবনের কত কথাই আড়ালে থেকে যায়। এই আড়ালে থাকার কারণও নানা বিধ। এই ঘটনাটা শুনে আপনারা বলবেন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে তো মানুষ বিগড়ে যায় হ্যাঁ সেটাই হয়ত সত্য। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও থাকে। যেটা হয়েছে রমেশবাবুর জীবনে। কারণ ওই ঘটনার সঙ্গে রমেশের সুখ, দুঃখ, ভালো-লাগা আবেগ, হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এই রকম কিছু না-বলা কথা, বা প্রশ্রয় দেওয়ার ঘটনা আমরা সারাজীবন ধরেই স্মৃতির ভেলায় বয়ে নিয়ে চলেছি। আমার ক্ষেত্রে সেটা আনন্দ ও গর্বের বিষয় হয়েছে। আবার এই প্রশ্রয় দান অনেকের জীবনে হয়ত-বা ভয়াবহ বেদনার কারণ হয়েছে। তাই কোন্‌টা প্রশ্রয় দেবেন আর কোন্‌টা দেবেন না এই বিচারের দায়িত্ব রইল আপনাদের ওপর। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল।

সমর্পণ

সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

কয়েকদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে, সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস, হাওয়া অফিসের খবর এরকম কয়েকদিন চলবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার নিম্নচাপ। শীতকালে দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও পুবের দিকে সচারাচর এমনটা হয় না। বৃষ্টি থামার পর আকাশের গুমোট ভাবটা সরে গেছে। তাই বোধ হয় মাঘের শীতটা এবার জাঁকিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড শীতের দাপটে চারপাশের প্রকৃতিতে কেমন একটা ঝিমুনিভাব। মাঘের বিকেলে সাততাড়াতাড়ি সন্ধে নামে।

রাত জেগে বইপড়া বিমলার বহুদিনের অভ্যেস, কিন্তু আজ আর ভালো লাগছে না। শীতের বৃষ্টি বড় বিশ্রী। সুবিমল এখন আর হাঁটা-চলা প্রায় করতে পারে না। বহুদিন হল ওর ঘরবন্দি জীবন, মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে গেলে হুইল চেয়ারে চেপে বাইরে ঘুরে আসে। বিমলার আজ খিদে নেই। সুবিমলকে রাতের খ াবার খেতে দিয়ে শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ শুয়ে আছে। ঘুম আসে না। উশখুশ করে। রাত গভীর হয়। মাঝরাতে ছবির অ্যালবামে চোখ রাখে বিমলা, বিয়ের ছবি, পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর ছবিগুলো একান্তে কতবার যে দেখেছে তার ঠিক নেই। আজ আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে হল। সমুর বারো বছরের জন্মদিনের ছবিগুলো বড় ভালো। পুরোনো বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ে। কয়েকটি ছবি চোখে পড়ায় নিঃশব্দে চোখে জল আসে। সমুর ওই জন্মদিনটাই তো তার জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে। পাশে সুবিমল শুয়ে আছে।কিছু টের পেল কিনা জানা নেই। শীতের হিমেল আবেশে কখন যে ঘুম এল মনে নেই। তবুও বেশ ভোরে বিমলার ঘুম ভেঙে গেল। একে ঘুম বলে না। তন্দ্রা হতে পারে। গায়ে চাদর জড়িয়ে উঠে পড়ে বিমলা। পায়চারি করতে করতে বাড়ির ভিজে উঠোনের দক্ষিণে আম গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। ভোরের ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারে চোখে-মুখে। কুয়াশায় চোখ-মুখ ভিজে যায়। আজ সমুর জন্মদিন। সদ্য চোদ্দোতে পা দিল ও। এই জন্মদিনটা একেবারে ম্যাড়মেড়ে জৌলুসহীন।

সুবিমল আর বিমলার একমাত্র ছেলে সমু। সমুর জন্মদিনে সুবিমল সব সময় নানা প্ল্যান করত। অবশ্য তা শুধু বিমলার চাপে, সাতসকালে হরেক কিসিমের বাজার আসত বাড়িতে। এলাহি আয়োজন হত। মাঝে মধ্যে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়া হত সমুর বায়নাতে। বেশি বাড়াবাড়িতে সুবিমল মাঝে মাঝে বিরক্ত হত। তবে সুবিমল শুধু বলত জন্মদিনের পায়েসটা ভালো করে কোরো। সমু পায়েস খেতে খুব পছন্দ করে। বিয়ের পর বেশ অনেক বছর বিমলার কোনো সন্তান হয়নি। মেয়েলি কিছু সমস্যা ছিল। সুবিমল অবশ্য প্রথম থেকেই সংসার জীবনে উদাসীনই ছিল। নতুন বউয়ের প্রতি সেভাবে তার টান ছিল না। বাবা, মা-এর পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করতে হয়েছে। তাই মনে মনে একটা অব্যক্ত ক্ষোভ ছিল। ওর সব বন্ধুরা প্রেম করে নিজেদের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করেছে। কেবল ও সেটা করতে পারেনি। এ-কথা দু-একবার বিমলাকে বলেছে সুবিমল। বিমলা যদিও দেখতে মোটেই মন্দ নয়। তবু বিমলা কেন যেন সুবিমলের একেবারে মনের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। বিমলা যথেষ্ট বুদ্ধিমতি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। অনেকবার একান্তে সুবিমলের কাছে জানতে চেয়েছিল কোনো দিন কারো প্রেমে পড়েছে কিনা। সুবিমল এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে সবসময়।

কয়েক বছর ধরে নাতি-নাতনির কোনো মুখ দেখতে না-পেরে শ্বশুর-শাশুড়ির ভাবনা হয় দাশগুপ্ত বংশ বোধ হয় আর রক্ষা হল না। আত্মীয়-বন্ধুরা খোঁচা দেয় এ বউ হয়ত মা হবে না। সুবিমল অবশ্য হাল ছাড়েনি। সুভদ্র স্বামীর মতো বিমলাকে নিয়ে যায় বেহালার বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মিত্রর কাছে। ডা. মিত্র বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর বিমলা মা হয়। বিমলার কোল আলো করে এল সমু, মানে সৌম্যকান্তি দাশগুপ্ত। অন্ধকারময় বাড়িতে আলোয় ভরে গেল সমুর আগমনে।

সন্তানের বাবা হওয়ার জন্য সব চেষ্টা সুবিমল করেছিল একথা ঠিক। তবে সমুর জন্মে সুবিমল কতটা খুশি হয়েছিল তা বলা মুশকিল। সে যাই হোক, বাবা হয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছিল তার সংসার জীবনে। বুড়োবুড়ি তো দাদুভাই বলতে অজ্ঞান। দাশগুপ্ত পরিবারে বিমলার কদর বেড়ে গেল। সমুর সামান্য কিছু হলে শাশুড়ি মা একেবারে বাড়ি মাথায় করতেন। শ্বশুরমশাই বলতেন মাথা ঠান্ডা রাখতে।

শাশুড়ি মা শিবানীদেবী রাশভারী মহিলা। রেগে গিয়ে শ্বশুরকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলত — 'তুমি প্রতিদিন এই দুধের শিশুকে পাড়ায় ঘুরতে নিয়ে যাও কেন? জানো তো মন্দ লোকের অভাব নেই।'

শ্বশুরমশাই রীতেশবাবু বলতেন, 'ছাড়ো তো তোমার যত সব কুসংস্কার।'

শিবানীদেবী বললেন আমার কুসংস্কার? তোমার জন্যই

তো সমুর সর্দি, কাশি, জ্বর-জাড়ি লেগেই আছে। তুমি খবরদার দাদুভাইকে আর বাইরে নিয়ে যাবে না।

শ্বশুরমশাই বলতেন, দ্যাখো শিবানীদেবী ছোটোবেলায় রোগ- বিসুখ একটু বেশি হয় বাচ্চাদের। ও বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি অত উদ্‌বিগ্ন হয়ো না।

রীতেশবাবুর কথা শুনে শিবানী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'তুমি চুপ করো। অমন অলক্ষুণে কথা বলো না। সারা জীবন তো কেরানিগিরি করে কাটালে। বাচ্চা মানুষ করার তুমি কি বুঝবে?'

আঃ মা থাক না বাবাকে তুমি অহেতুক বোকো না। বলে বিমলা, কী বললে বউমা? আমি ওকে বকছি?

তুমি জানো কী করে আমি একা হাতে সোনাইকে মানুষ করেছি। তোমার শ্বশুর তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াল, আর এক সময় দেখল ছেলে বড়ো হয়ে গেছে।

থাক মা। সেকথা শুনে এখন আর কাজ নেই। বলে বিমলা। শিবানীর শখ বড়ো হয়ে দাদুভাই বিজ্ঞানী হবে। নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করবে। আর যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে মনে রাখবে। শ্বশুরের ইচ্ছে সমু মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে।

বাবা ও মা-এর মতো সুবিমলের অবশ্য তেমন কোনো বাতিক নেই। ছেলে বড়ো হয়ে যা ভালোবাসবে তাই পড়বে।

বিমলার বেশ মনে আছে যেদিন সমু প্রথম স্কুলে ভরতি হল সেদিন উঠোনে এই আম গাছটা পুঁতে ছিল শ্বশুরমশাই। তিনি বলতেন আম হল ফলের রাজা। সকলেই পছন্দ করে। আমার দাদুভাইও একদিন সবার পছন্দের মানুষ হবে। সমু এখন বাড়ির সকলের নয়নের মণি। আধো আধো বুলিতে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। সুবিমলের শুধু সব কিছুতেই গা ছাড়া ভাব। কোনো কিছুতে তেমন মন নেই। সব কিছুতেই তার একটা উদাসীন ভাব। তবে আর পাঁচজন বাবার মতো সাধারণ সব দায়দায়িত্ব-কর্তব্য নিঃশব্দে সে পালন করত।

সমুর বেশভালো মতো জ্ঞান হওয়ার আগে সুবিমল দু-এক বছরের ব্যবধানে পর পর বাবা-মাকে হারাল। এরপর সুবিমল একেবারে একা হয়ে যায়। মাথা থেকে বট গাছের ছায়ার মতো বাবা-মা সরে যাওয়ায় সুবিমল গভীর শোকের সাগরে ডুবে গেল। মানসিক ভাবে একেবারে ভেঙে পড়ল।

সুবিমল এরপর থেকে রোজ দেরি করে বাড়ি ফেরা শুরু করল। নিয়মিত সিগারেট খেতে শুরু করল। এ অভ্যেস তার কোনোদিনও ছিল না। গভীর অবসাদ গ্রাস করল তাকে। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। একদিন তো ওর অফিসের ব্যাগে পাওয়া গেল হুইস্কির বোতল।

ছি ছি ছি! তুমি এতটাই নিচে নেমে গেছ। তোমার এতটাই অধঃপতন ঘটেছে যে এইসব ছাইপাঁশ খেয়ে বাড়ি ফিরছ। বিমলা এসব বলে তুমুল অশান্তি করে।

কেনো, ছেলেরা কি কোনো নেশা করে না নাকি? ঝাঁঝিয়ে ওঠে সুবিমল।

সুবিমলের কথায় বিমলা অবাক হয়ে যায়! সারাজীবন মুখ চোরা মানুষটা আজ এসব কথা বলছে। এ তো অচেনা ...।

হ্যাঁ পারে। রেগে উত্তর দেয় বিমলা। তাই বলে তুমি। তুমি কলেজের একজন শিক্ষক। সমাজে তোমার একটা মর্যাদা আছে। তোমার এসব মানায় না। ঠিক আঝে তুমি চুপ করো। এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলল সুবিমল।

কী বলছ তুমি? একবার ভেবে দেখেছ। সমু এত ছোটো আর বাড়িতে আমি একা মেয়েমানুষ। আর তুমি কিনা ...।

কেন আমি কি তোমাদের কোনো কিছুর অভাব রেখেছি, অসুখী করে রেখেছি নাকি?

না তা রাখোনি বটে, তবে আমাদের অসুখী করেছ তোমার আচার-আচরণ পরিবর্তন করে। যা আমি কোনোদিন তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি। বলল বিমলা।

সামনের মাসে সমু বারোতে পা দেবে। বিমলা বায়না ধরল এবারের জন্মদিনটা ধুমধাম করে পালন করবে। বরাবরের মতো সুবিমলের এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ নেই। তবে নিমরাজি হলেও গিন্নির আবদারে বাদ সাধল না।

সুবিমল রাজি হওয়ার মনে মনে খুব খুশি হল বিমলা। মন ভরে সব বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনদের নেমতন্ন করল। বিমলার কলেজের খুব প্রিয় বান্ধবী ছিল রূপসা আর নন্দিনী। তিন জনের বন্ধুত্ব দেখে কলেজের বন্ধুরা ওদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলত। বিমলা রূপসাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে ওর কাছ থেকে নন্দিনীর ফোন নম্বরটা পেল বহুদিন পর।

হ্যালো—আমি বেহালা থেকে বলছি।

ফোনের ওপার থেকে উত্তর এল কে বলছেন?

আপনি কে বলছেন? জিজ্ঞাসা করে বিমলা।

প্রত্যুত্তর এল আপনি কে বলছেন? আর কাকে চাইছেন?

বিমলা একটু ইতঃস্তত করে বলল-আসলে আমি বিমলা দাশগুপ্ত বলছি। আর চাইছি নন্দিনী সেনকে।

ওঃ মা বিমলা! তা আগে বলবি তো। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কোনো অফিসের কল ভেবে। বলে নন্দিনী।

ছি ছি! কিছু মনে করিস না। আমি তো বুঝতেই পারিনি।

যাক তুই কেমন আছিস বল্। জিজ্ঞাসা করে নন্দিনী। এই একরকম ভালোই আছি। বলে বিমলা।

নন্দিনী—এত বছর পর তুই আমার নম্বর কোথা থেকে

পেলি। বিমলা হাসতে হাসতে বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় বন্ধু।

রূপসার কাছ থেকে ...।

ওঃ তাই বল। ওর সঙ্গে আমার একবার এন জি পি স্টেশনে দেখা হয়েছিল, সে সময় আমার নম্বরটা নিয়েছিল। যাক বাবা এত বছর পর তাহলে আমার কথা তোর মনে পড়ল। বলে নন্দিনী।

বিমলা উত্তর দেয়, তুই বুঝি আমাকে খুব মনে রেখেছিস। কী করে রাখব বল। আমার জীবন এখন অন্য রকম। আমার সুখ, শান্তি সব হারিয়ে গেছেরে বিমলা। নন্দিনীর গলাটা বেশ ভারী হয়ে এল।

থাক নন্দিনী আমি তোর সব ঘটনা রূপসার কাছে শুনেছি। বলে বিমলা।

তা বল্ তোর সংসার জীবন কেমন চলছে। তোর ছেলে-পুলের সংবাদ কিছু হল। বিমলার কাছে জানতে চায় নন্দিনী।

বিমলা হাসতে হাসতে বলল— আরে সে কথা বলব বলেই তো তোকে ফোন করলাম।

আমার ছেলে সমু সামনের মাসের ন-তারিখে বারোতে পড়বে। ওই দিন আমার বাড়িতে তোর নিমন্ত্রণ। হোয়াটসঅ্যাপে তোর ঠিকানাটা পাঠাবি, কার্ড পাঠিয়ে দেব পোস্ট করে। তোকে অবশ্যই আসতে হবে। আমি তোর কোনো অজুহাত শুনব না। বিমলার নাছোড়বান্দা মনোভাব দেখে নন্দিনী বলল আচ্ছা বাবা তাই হবে। আমি আসার চেষ্টা করব।

ঠিক আছে এলে পরে সব কথা হবে। এখন রাখছি বলে ফোন রেখে দেয় বিমলা।

ঘরদোর গোছগাছ, কেনাকাটা করে বিমলার কয়েকদিন ধরে বেশ ধকল গেল। তবু ও আজ বিকাল থেকে বিমলার মনটা বেশ ফুরফুরে। সারা বাড়িতে আলো ঝলমল করছে। আত্মীয়-স্বজনের আগমনে অনেকদিন পর বাড়িটা বেশ গম গম করছে। কতদিন পর পুরোনো সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। বিমলার সঙ্গে সমুও খুশিতে ডগমগ। নন্দিনী এল সন্ধে গড়িয়ে। সঙ্গে মেয়ে রিম্পা। বিমলা প্রায় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে নন্দিনীকে। তোর এত দেরি হল কেন? জানতে চাইল বিমলা।

আর বলিস না কাঞ্চনকন্যা চার ঘণ্টা দেরিতে চলছে। তা হোক, যা হওয়ার হয়েছে। তুই ওপরের ঘরে চলে আয়। হাত-মুখ ধুয়ে বা চান করে নিয়ে ফ্রেস হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেল্। বাঃ তোর মেয়ে তো ভারী সুন্দরী আর ফুটফুটে হয়েছে দেখছি। বলল বিমলা।

কত বয়স হল?

এই এ বছর নয়-এ পড়ল। উত্তর দেয় নন্দিনী।

ও তাহলে তোর মেয়ে তো আমার সমুর চেয়ে ছোটো। বলে বিমলা।

আরে হ্যাঁ! সুচন্দন অনেক পরে চাকরি পায়। তার পর তো আমার মেয়ে হয়েছে।

রাতের দিকে বাড়ির ছাদে আত্মীয়দের নিয়ে একটা গানের আসরের আয়োজন রেখেছিল বিমলা। রূপসা আর বিমলা বায়না ধরল নন্দিনীকে একটা গান শোনানোর জন্য। নন্দিনী প্রথমে রাজি না-হলেও শেষে বন্ধুদের পীড়া-পীড়িতে একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইল, 'আমারও পরাণ ও যাহা চায়, তুমি তাই ...'

নন্দিনী দেখতে যেমন অপরূপা সুন্দরী তেমনি গানের গলাটাও ভারি মিষ্টি। যেন একই শরীরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন। সুবিমল গানের আসরে উপস্থিত না-থাকলেও ঘরের মধ্যে থেকে গানটা শুনতে পেল। সুবিমল একেবারে চমকে উঠল। এ গানের গলাটা তার খুব চেনা। এই গানটা তো সে প্রথম যৌবন থেকে মনে মনে গুনগুন করে আসছে। কত দিন কত রাত তো সে অপেক্ষা করে আছে এই গানটি একজনের গলায় শুনবে বলে।

সাঁইথিয়ায় থাকার সময় ওখানকার টাউন ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই গানটা শুনেই তো প্রিয়াকে তার ভালো লেগেছিল। সেই ভালোবাসাই তো সারাজীবন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেই দিন থেকেই তো সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে সুবিমল শুধু প্রিয়াকে অনুভব করে।

সুবিমল জীবনে মানসম্মান, অর্থ সব কিছু পেয়েছে, তবুও মনে করে তার কিছুই পাওয়া হয়নি। আজ এই গানটা শুনে সুবিমলের মনটা হাহাকার করে ওঠে। সে ঘরে বসে মনে মনে গুনগুন করতে লাগল— 'আমার ও পরান যাহা চায় ...।' মনে মনে ভাবল প্রিয়া নয় তো! মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

অনুষ্ঠান শেষে বিমলা নন্দিনীকে নিয়ে এল সুবিমলের ঘরে পরিচয় করানোর জন্য। নন্দিনীকে দেখে সুবিমল একেবারে চমকে উঠল। অবাক হয়ে ভাবল এতক্ষণ যা ভাবছিল সেটাই সত্যি হল দেখছি। এটা কী করে সম্ভব? ওর হৃদয়ে কাঁপুনি শুরু হল। হাত- পা যেন অসাড় হয়ে আসছে। একই অবস্থা নন্দিনীর হল কিনা বোঝা গেল না। তবে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাথা নিচু করে শুধু নমস্কার করল। দুজনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। ওদের মনের অবস্থা বিমলা বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারল না। তার বোঝার কথাও নয়।

সুবিমল নিমেষে হারিয়ে গেল প্রিয়ার মধ্যে। প্রিয়ার প্রকৃত নাম নন্দিনী সুবিমল তা জানত না। অবিকল সেই মুখমণ্ডল। সেই

উজ্জ্বল গভীর চোখ, সেই মনমোহিনী লাবণ্য, মুখে ভুবন-মোহিনী সরল হাসি এখনও অটুট আছে। শুধু একটু বয়স বেড়েছে মাত্র।

সুবিমল প্রতিটি মুহূর্তে এতদিন যাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সেই প্রিয়া আজ এখন তার ঘরে। নন্দিনীর উপস্থিতিতে সুবিমল মনে করল তার ঘর আরও আলোকিত হয়েছে। সত্যি কী তাই হল? মনের ভুলও হতে পারে। নন্দিনীর এই আকস্মিক উপস্থিতিতে সুবিমলের যেমন দারুণ ভালো লাগল তেমনি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল মনে মনে।

সুবিমল মনে করে নারীর সৌন্দর্যের এক অমোঘ আকর্ষণ থাকে যা সহজেই পুরুষ মানুষকে আকর্ষণ করে। নারীত্বের সেই আবেদন বিমলার হয়ত বা আছে। কিন্তু সুবিমলকে তা কোনোদিন আকর্ষিত বা রোমাঞ্চিত করেনি। হয়ত বিমলার প্রতি উদাসীন থাকার জন্য তা হতে পারে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সুবিমল একটু দেরি করেই বলল ওঃ হ্যাঁ আমি বিমলার কাছে আপনার নাম বহুবার শুনেছি।

সারারাত সুবিমল দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না। জল থেকে তুলে আনা মাছের মতো ছটফট করেছে। বিছানায় বিনিদ্র রজনিতে চোখ বুজলেই কেবল প্রিয়া-র (নন্দিনী) সেই মায়াবী চোখের গভীরতার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে সুবিমল। যেন সে সত্যিকরে এতদিনে কারো প্রেমে পড়ল।

যে স্বপ্ন সুন্দরী এত বছর ধরে তার সারা মন প্রাণ জুড়ে বসে আছে, আর আজ হঠাৎই সে কিনা ...। এক অদ্ভুত ভালো লাগার আবেশে বুঁদ হয়ে রইল সুবিমলের মন।

এই প্রথম কলকাতায় এসেছে নন্দিনী আর ওর মেয়ে। 'সমু আর ওদেরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, মিলেনিয়াম পার্কে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।' সুবিমলকে বলে বিমলা।

তোমরা দুই বান্ধবী মিলে যাও। আমার সময় নেই। কলেজের অনেক কাজ পড়ে আছে।

বিমলা উত্তর দেয় আমার অন্য অসুবিধা আছে। পরে যেয়ো বলে সুবিমল। বিমলা এতে রেগে বলল। তা পারবে কেন?

কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিকনিক করতে পারো, যখন-তখন ঘুরতে নিয়ে যেতে পারো, সে সময় কাজ থাকে না। আর এখন ...।

নন্দিনী বলল থাক না বিমলা কেন মিছে মিছে ঝামেলা করছিস। সুবিদার সময় যখন নেই ...।

বেচারা হতভাগিনী নন্দিনী ভালোবেসে সুচন্দনকে বিয়ে করেছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মা ও বাবা-র অমতে। কিন্তু দু-বছর আগে সুচন্দন মারা গেল মারণ ক্যানসারে ভুগে। বরের পেনশনে সংসার চালায়। মেয়ে ছোটো বলে কোনো চাকরি করেনি। সারাক্ষণ বাড়িতে থাকে, কোথাও ঘুরতে যেতে পারে না।

তাই বলছিলাম কলকাতায় যখন এসেছে ...।

সুবিমল অবশ্য মনে মনে এটাই চাইছিল। ঠিক আছে আগামীকাল সবাইকে তৈরি থাকতে বলো।

সুবিমলের জীবনে আজ সবচেয়ে খুশির দিন। এই প্রথম সে তার প্রথম জীবনের প্রেমিকা প্রিয়াকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মায়ের কাছে পুজো দিল প্রিয়া। ধবধবে সাদা গরদের শাড়িতে প্রিয়াকে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে। প্রিয়া সুবিমলের হাতে মায়ের প্রসাদ দিয়ে পায়ে প্রণাম করে এই প্রথম বলল কেমন আছ সোনাইদা। সুবিমলের চোখে জল। প্রিয়া তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে! আমি তো তোমায় কত খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও তোমার কোনো হদিশ পাইনি। বলে সুবিমল। প্রিয়া কোনো উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

গঙ্গার ধারে গাছের ছায়ায় বসে প্রিয়া বলল সোনাইদা আমি কোথাও হারিয়ে যাইনি। বাবা হঠাৎ বদলি হয়ে যায় ডিভিসিতে। আমরাও সবাই ওখানে চলে যাই। ওখানে গিয়ে একটি স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভরতি হই। এরপর পড়ি উত্তরবঙ্গ কলেজে। ওখানেই রূপসা আর বিমলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু আমি তোমার সাঁইথিয়ার বাড়ির ঠিকানায় কত চিঠি লিখেছি। একটা চিঠিরও উত্তর পাইনি। তারপর কলেজের সিনিয়র সুচন্দনের সঙ্গে আলাপ হয়। ভারি চটপটে প্রাণোচ্ছল একটা মানুষ। ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওর ভালোবাসা আমাকে ভুলিয়ে দেয় সব অতীত। একসময় কলেজের পড়া শেষের আগেই আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি। এরপর সবার সঙ্গে আমার একপ্রকার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আর বিমলা যে তোমার বউ হয়েছে সেটা এখন জানলাম।

সুবিমল বলল তা হবে হয়ত। বাবাও আমার পড়াশোনার সুবিধার জন্য সাঁইথিয়ার বাড়ি বেচে দিয়ে বেহালায় চলে আসে। এখানে তোমাকে আর কোথায় বা পাব। তাও যখন যেখানে পেরেছি হন্যে হয়ে অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোথাও ...।

যাক ভালোই হল আবার যখন দেখা হল ...।

নন্দিনী বলল আগে আমি কখনো দক্ষিণেশ্বরে আসিনি, গঙ্গার ধারে জায়গাটা দেখছি ভারি সুন্দর। ভাগ্যি ভালো তোমার বাড়ি এলাম বলে রানি রাসমণি, রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ পীঠস্থানের পুণ্যভূমির স্পর্শ পেলাম। রিম্পা ও সমু ঘুরে বেড়ানোর মজা বেশ উপভোগ করছে।

মিলেনিয়াম পার্কে রিম্পা আর সমুর বায়নাতে গঙ্গায় নৌকা চড়ার জন্য একটা নৌকো ভাড়া করল সুবিমল।

সোনাইদা তোমরা নৌকোয় চড়তে যাও। আমি নৌকোয় উঠব না। কেন তোমার আবার কী হল?

আমি সাঁতার জানি না, আমার ভয় করছে। যদি কিছু হয়, বলল প্রিয়া।

আরে কিছু হবে না। আমি তো আছি। তুমি উঠে এসো নৌকোয়। না না আমি একা উঠতে পারব না। তুমি আমার হাতটা ধরো, বলল প্রিয়া।

সুবিমল নিজের হার্টবিট শুনতে পেল। স্কুলে পড়ার সময় প্রিয়ার এই নরম তুলতুলে হাত একবার স্পর্শ করেছিল সুবিমল। আজ আবার পূর্ণ বয়সে সে প্রিয়ার ...। কত যুগ ধরে সে এই ছোঁয়া পেতে অপেক্ষা করে আছে আর আজ কিনা কত সহজেই তার স্বপ্ন সফল...।

মনপ্রাণ দিয়ে কোনো কিছু চাইলে ঈশ্বর বোধহয় তাকে নিরাশ করেন না। সুবিমলের এই দার্শনিক কথা মনে এল। পড়ন্ত বিকালের মলয় বাতাসে নৌকোতে বসে ওদের মন তরতাজা হয়ে উঠল।

গঙ্গাবক্ষে সোনাই আর প্রিয়া। দুই ভিন্ন পথের পথিক। সুবিমল বলল প্রিয়া তোমার আর প্রেমে পড়তে ইচ্ছা করে না। আপন বেগে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী গঙ্গার সদা চঞ্চলা প্রবাহের দিকে আনমনে চেয়ে থাকে প্রিয়া। যেন সুবিমলের কোনো কথা সে শুনতে পেল না। কোনো উত্তরও দিল না সে।

নিরবতা ভেঙে সুবিমল বলল, প্রিয়া তোমার মনে আছে সাঁইথিয়াতে একবার দোলের সময় দুষ্টুমি করে তোমার মাথায় আবিরের বদলে মায়ের কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে দিয়েছিলাম। প্রিয়া এবার শুধু ঘাড় নাড়ে। তবে চুপ করে থাকে।

সুবিমল লক্ষ করল প্রিয়ার চোখের কোণে জল চিক চিক করছে। তোমার কী হল? জানতে চায় সুবিমল। মাথা নিচু করে চোখ মুছতে মুছতে প্রিয়া বলল প্লিজ তুমি পুরোনো দিনের কথা আমার আর মনে করিয়ো না। সুবিমল আর কথা বাড়ায় না।

নন্দিনী আজ শিলিগুড়ি ফিরে যাবে। রাতে ট্রেন। বিমলা ব্যস্ত ট্রেনে ওদের খাবারটা বানিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রিয়া এক সময় সুবিমলের ঘরে গিয়ে বলল-সোনাইদা সময় পেলে একবার শিলিগুড়িতে এসো।

সুবিমল অস্ফুটে বলল যেতে তো চাই। তবে সুযোগ কোথায়? শিয়ালদা স্টেশনে প্রিয়াকে ছাড়তে এসেছে সুবিমল। দার্জিলিং মেল ছাড়ার আগে প্রিয়া সুবিমলের হাতে একটা চিরকূট দিয়ে বলল-আমি চলে গেলে তবেই এটা পড়বে। আমি আসছি ভালো থেকো। ট্রেন থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল প্রিয়া। ট্রেন অনেক্ষণ হল চলে গেছে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুটা এদিক-ওদিক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করল সুবিমল। তারপর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে চিরকুটটি খুলে দেখল।

সুপ্রিয় সোনাইদা,

এই ক-দিন তোমার বাড়িতে তোমাদের সঙ্গে বেশ ভালো সময় কাটালাম। তোমার সঙ্গে যে এভাবে দেখা হবে আমি কখ নো স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে আমার মনে হয় এভাবে আমাদের দেখা না-হলে ভালোই হত। তুমি হয়ত তোমার প্রিয়াকে ভুলেই গিয়েছিলে। কিন্তু এভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হওয়ায় তুমি হয়ত শুধু শুধু কষ্ট পেলে। আর আমি এই ক-দিন কেমন ছিলাম নাই বা জানলে সে কথা। তুমি তো শুনেছ প্রেম করেই আমি সুচন্দনের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলাম। কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারলাম কই। আমার ভালোবাসার সে শক্তি কোথায়? এখন এ জীবনে নতুন করে কাউকে ...। যা পারো বুঝে নাও। বিমলা তোমার মনের রানি। বড় ভালো মেয়ে। ওকে তুমি ফাঁকি দিয়ো না। সংসারের মায়াডোরে যখন বাঁধা-ই পড়েছ পুরোনো স্মৃতি সব ভুলে যাও। আর নতুন করে কারো ...। নিজের অজান্তে যদি কোনো ভুল করে থাকি তো মাপ করে দিয়ো। ভালো থেকো।

ইতি,
তোমার প্রিয়া

আত্মীয়স্বজন সব চলে গেছে। সারা বাড়িটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। সুবিমলকে কেমন যেন ক্লান্ত, অবসন্ন ও আনমনা লাগছে। তোমার কি শরীর ভালো নেই, জিজ্ঞাসা করে বিমলা।

না কিছু হয়নি। উত্তর দিল সুবিমল।

এই ক-দিনে সুবিমল প্রিয়ার দেওয়া চিরকুটটা যে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই। যতবার পড়েছে ততবার ভালো লেগেছে। আর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে প্রিয়ার অন্তরে। একদিকে বিমলা সমু আর অন্যদিকে প্রিয়া, রিম্পা। এই টানাপোড়েন সে নিজেই নিজে তৈরি করেছে। আর মনে মনে গুন গুন করেছে — 'আমারও পরান ও যাহা চায় ...।'

তোমার কাছে নন্দিনীর ফোন নম্বরটা আছে? রাতে ঘুমোবার সময় সুবিমল বিমলাকে জিজ্ঞাসা করে একটু ইতঃস্তত ভাবে। হ্যাঁ আছে। ওর নম্বর নিয়ে তোমার কী হবে?

না তেমন কিছু নয়। একটু লজ্জিত হয়ে বলল সুবিমল। আসলে নন্দিনী মেয়েকে নিয়ে ঠিকমতো বাড়িতে ফিরল কিনা খোঁজ নেওয়া হয়নি। তাই ...।

ওঃ হ্যাঁ আমিই তোমাকে বলতে ভুলেই গেছি, আজ দুপুরে

ওকে ফোন করেছিলাম। রিম্পার একটু জ্বর জ্বর ভাব। আর নন্দিনী তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যাক কাল একবার ফোন করে দ্যাখো।

পরদিন একটু সময় করে সুবিমল ফোন করে নন্দিনীকে। হ্যালো কে বলছেন? ফোনের ওপার থেকে একটা মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এল সুবিমলের কানে।

আমি বলছি।

ওঃ সোনাইদা। বলো ...।

তোমার মেয়ে কেমন আছে?

রিম্পা ভালো আছে। তবে একটু দুর্বল।

তুমি তো আর নম্বরটা দিলে না। তাই বাধ্য হয়ে বিমলার ...।

যাঃ তুমি চেয়েছ নাকি? যেচে কাউকে নম্বর দিতে নেই বুঝলে মশাই। হাসতে হাসতে বলে নন্দিনী।

আমি তো বেহালায় গেলাম। তোমরা সবাই কবে শিলিগুড়িতে আসছ।

চিন্তা করো না মনের হারানো মানসীকে একবার খুঁজে যখন পেয়েছি তখন খুব শিগ্‌গির যাব।

তা জানতে পারি কি মশাই তোমার মনের মানসীটি কে?

কেন তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? এত বোকা তো নও তুমি। কত কিছু বোঝ আর এটা ...। বলে হাসতে থাকে সুবিমল।

নন্দিনী কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে গেল।

কী কোনো কথা বলছ না যে। সুবিমল জিজ্ঞাসা করল।

না সোনাইদা তুমি যা ভাবছ তা কোনো দিনই হবে না ...। তুমি আমাকে ভুলে যাও। আমি আর ওই জীবনে ফিরে যেতে চাই না।

তাছাড়া আমি আর কারোও করুণা চাই না।

কিন্তু কেন? স্কুলে পড়ার সময় তুমি তো আমায় কথা দিয়েছিলে।

নন্দিনী— স্কুল জীবনের কথা, সে সব অতীত। তুমি ভুলে যাও।

কিন্তু তুমি তো আমার প্রিয়া। আমি তোমাকে আর হারাতে চাই না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি না, একেবারে যা তা। তোমার মুখে কিছু বাধে না দেখছি। তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি একজন বিবাহিত মানুষ। তুমি না বিমলার স্বামী। সৌম্য তোমার ছেলে। বলে ধমক দেয় নন্দিনী। তাতে কী হল। ওদের আমি কোনো কিছুতে বঞ্চিত করব না। এতদিন দিন ধরে আমি শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। তুমি তো আমারই। আমি কী তোমাকে নতুন করে ভালোবাসতে পারি না। বলে নিজের মনের আর্তি প্রকাশ করে সুবিমল।

হ্যাঁ তুমি হয়ত তা পারো। সেই অধিকার তোমার হয়ত বা আছে। এতে দোষেরও কিছু নেই। কিন্তু যে-কোনো মূল্যে বিমলার প্রতি তুমি অবিচার করতে পারো না। আইনের চোখে এ অপরাধ। পাপ কিনা তা আমি জানি না। তবে স্বামী হারানোর কী ব্যথা আমি তা বুঝেছি। তুমি দয়া করে এই আজেবাজে ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করো সোনাইদা। বলল প্রিয়া (নন্দিনী)।

এসব কথা শুনে সুবিমল কোনো উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। নীরাবতা ভেঙে প্রিয়া বলল—তোমার গবেষণার খবর কী? ওই একরকম চলছে। উত্তর দিল সুবিমল। সে যেন আর কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

আজ তাহলে রাখছি। পরে ফোন কোরো সময় করে। বলে লাইনটা কেটে দিল নন্দিনী।

এরপরও সুবিমল বেশ কয়েকবার প্রিয়াকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু কোনো ভাবেই সে প্রিয়ার মন জয় করতে পারল না। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

নন্দিনীর বাড়ির সামনে একটা সাদা মার্সিডিজ কার এসে দাঁড়াল। ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে দেখতে পেল নন্দিনী।

বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে একেবারে অবাক হয়ে গেল।

ওমা এ কী! সোনাইদা যে। কোনো কিছু সংবাদ না-দিয়ে। তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে। বলল সুবিমল। নন্দিনী একটু অপ্রস্তুতিতে পড়ে গেল। সুবিমল একে বন্ধু, তার ওপর অধ্যাপক মানুষ বলে কথা। একটু সংকোচে ও পড়ে গেল।

'কিন্তু এ সময় আমি যদি বাড়িতে যদি না-থাকতাম', বলল নন্দিনী।

নো প্রবলেম। আমি কলেজেই চলে যেতাম।

তার মানে। জিজ্ঞাসা করে নন্দিনী।

আরে হঠাৎই আমাদের রসায়ন বিভাগের শিক্ষকদের একটা কনফারেন্স পড়েছে তোমাদের শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট কলেজে, তাই চলে এলাম।

রিম্পা কোথায়? দেখছি না যে।

নন্দিনী বলল ও তো হস্টেলে। ওঃ তাই।

তুমি কি অস্বস্তিতে পড়লে নাকি? জানতে চাইল সুবিমল। আরে না না কী যে বলো। তা কেন হবে। তুমি আগে বসো। হাত-মুখ ধোয়। আমি চা করে আনছি।

সুবিমলকে চা জল খাবার খেতে দিয়ে নন্দিনী বলল-তা ক-দিন থাকবে। দিন সাতেক। উত্তর দিল সুবিমল।

নন্দিনী মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করল বটে কিন্তু তা প্রকাশ করল না। সুবিমল বলল তুমি নিশ্চিন্ত থাকো প্রিয়া। আমি তোমাকে কোনো বিপদে ফেলতে আসিনি। শুধু একটাই শর্ত

আমি যা যা উপহার তোমাদের জন্য এনেছি তুমি তা ফেরত দেবে না।

যাঃ, তুমি কি যে বলো না। বিপদ আবার কী? বলে প্রিয়া।

দুপুরে প্রিয়ার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে বিকালে কলেজের গেস্ট হাউসে ফিরে যাওয়ার সময় সুবিমল বলল রেডি থেকো প্রিয়া আগামী পরশু তোমাকে নিয়ে বিন্দু, ঝালং-এর দিকটা একটু বেড়াতে যাব। প্রিয়া শুধু শুনল। তবে হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর দিল না।

সোনাইদার আনা শাড়িটা প্রিয়ার বেশ মনে ধরেছে। আজ সেটা পরে কতদিন পর প্রিয়া ঘুরতে বেরিয়েছে তার মনের মানুষ সোনাইদার সঙ্গে। ডুয়ার্সের আঁকাবাকা পথ, তার অপার সৌন্দর্য, চা বাগানের সারি, দিগন্ত বিস্তৃত পরিচ্ছন্ন ঘন নীল আকাশ, কোথাও বা ঘন শাল, পাইন, ঝাউ গাছের জঙ্গলের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সোনাই আর প্রিয়ার গাড়ি। প্রিয়ার বিষাদময় জীবনে আজকের দিনটা খুশির বন্যায় ভাসতে লাগল।

শিলিগুড়ি থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভারতের শেষ গ্রাম বিন্দু। এই গ্রামের প্রান্ত দিয়ে ভুটান পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী। উপল জলরাশি বড়ো বড়ো শিলা খণ্ডে প্রবল বেগে ধাক্কা খেয়ে সাদা স্বচ্ছ জল রাশির জলতরঙ্গ মাতিয়ে দিয়ে অনন্ত কাল ধরে জলঢাকা বয়ে চলেছে। এই জলঢাকার ওপারে ভুটান, এপারে ভারত ভূমি। এই সীমারেখা কেউ কোনোদিন অতিক্রম করেনি। ঠিক তেমনি ভাবে সুবিমল আর প্রিয়ার মাঝে চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুচন্দনের বিদেহী আত্মা, বিমলা, সমু, আর রিম্পা। শত যুগ ধরে তারা সে প্রাচীর অতিক্রম করতে চাইলেও তা তারা কখনই পারবে না। দুটি প্রাণ যতটা না একে অপরের কাছের ঠিক ততটাই দূর দূরান্তের দুটি গ্রহ। যাদের গতিপথ আলাদা।

জলঢাকার অশান্ত শীতল জলে পা দিয়ে একটি শিলা খণ্ডে প্রিয়ার হাত ধরে বসে সুবিমল। একটা সময় সুবিমল বলল, প্রিয়া আমাকে তোমার সত্যিই আর ভালো লাগে না?

প্রিয়া উত্তর দেয়, আমি জানি না।

তুমি প্রশ্ন করছ উত্তর তুমি খুঁজে নাও।

সুবিমল প্রিয়ার আরও কাছে আসতে চায়।

প্রিয়া বাধা দিয়ে বলল সোনাইদা প্লিজ তুমি আর আমাকে দুর্বল করে দিয়ো না। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওই দ্যাখো দূর পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে। চলো এবার ওঠা যাক। আমাদের অনেকদূর পথ ফিরতে হবে। বলল প্রিয়া।

হ্যালো শিলিগুড়ি নার্সিংহোম থেকে ডা. ছেত্রী বলছি।

নার্সিংহোমের কথা শুনে বিমলা চমকে উঠল।

উদ্‌বিগ্ন হয় বলল, হ্যাঁ বলুন।

আপনি কি বিমলা দাশগুপ্ত।

হ্যাঁ, কেন বলুন তো।

আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে চলে আসুন। গতকাল রাতে তিস্তা ব্যারেজের কাছে সুবিমলবাবুর গাড়িতে ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওনার চোট মারাত্মক।

হাসপাতালের পাশাপাশি ওয়ার্ডে নন্দিনী ও সুবিমল ভরতি। জরুরি অপারেশনে সুবিমলের ডান পা বাদ চলে গেছে। আর নন্দিনীর কোনো জ্ঞান নেই। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। ডাক্তারবাবুরা চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু কোনো আশ্বাস দিতে পারছেন না। সমু, বিমলা পালা করে হাসপাতালে থাকছে। রিম্পা- ও খবর পেয়ে বাড়িতে ফিরছে।

দিন তিনেক পর সামান্য জ্ঞান ফিরল নন্দিনীর, হালকা চোখ মেলে তাকাল। বিমলাকে সামনে দেখে চোখে নামল মন্দাকিনীর ধারা।

খুব ক্ষীণ স্বরে নন্দিনী বলল, বিমলা আমি তোর কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না। সোনাইদা আমার ছোটো বেলার বন্ধু। সাঁইথিয়াতে এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়তাম। আমি ক্লাস এইট আর ও টেন পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। আমিও বোধ হয় তাই। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে আমরা একে অন্যের কাছে থেকে হারিয়ে যাই। তবে ও কোনো দিন আমাকে কোনো অসম্মান করেনি। আমার জন্য ও অনেক কষ্ট পেয়েছে সারাজীবন। আজও হয়ত ওর জীবন বিপন্ন। সত্যি কথাটা তোর জানা দরকার ছিল। তাই বললাম। যখন জানলাম সোনাইদা তোর স্বামী আমি খুব খুশি হয়েছি এজন্য যে, একজন যোগ্য স্ত্রীর কাছে আছে একজন আবেগপ্রবণ মানুষ। আমার হাতে আর সময় নেই। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আমি সুচন্দনের কাছে চলে যাচ্ছি। বিমলার হাত ধরে নন্দিনী অনুরোধ করল। কথা দে তুই আমার একটা কথা রাখবি।

বিমলা বলল কী কথা বল্।

নন্দিনী কঁকিয়ে কেঁদে ফেলে বলল—আমার রিম্পা মা একেবারে অনাথ হয়ে গেল। আমি তোর হাতে ওকে ‘সমর্পণ’ করলাম। আজকের দিনে তুই আমাকে ফিরিয়ে দিস না। আর পারলে ওকে তুই তোর সমুর বউ করে নিস। এ অধিকার তোর কাছে আমার আছে। ওর মধ্য দিয়ে আমি সোনাইদা আর তোর মাঝে বেঁচে থাকব। শেষের কথাগুলো প্রায় জড়িয়ে গেল। আর বোধ হয় ...।

বিমলাও কেঁদে কেঁদে বলল থাক নন্দিনী এসব কথা। আমার ভাগ্যটাই খারাপ। তা না-হলে আমার কপালে এসব ঘটনা ঘটে।

নন্দিনীর কানে এসব কথা গেল কিনা জানা নেই। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিমলা বলল যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস। আর ভালো থাকিস ভালোবেসে বেসে। নন্দিনী চিরনিদ্রায় চলে গেল।

বিমলা মনে মনে বলল নন্দিনী তোর নারী জীবন সার্থক। আমি আমার অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা দিয়েও কোনো দিন সুবিমলের মন জয় করতে পারিনি। আর কোনো দিন তোর কাছে সুবিমল কোনো ভালোবাসা পায়নি। তবুও তুই আজীবন তার হৃদয়ের রানি হয়ে থেকে গেলি। একেই বোধ হয় বলে প্রকৃত মানবিক ভালোবাসা। যে এক প্রতিচ্ছবি হয়ে থেকে যায় সারা জীবনের জন্য একজন মানুষের মনে। এতদিনে বুঝতে পারলাম সংসার জীবনে সুবিমল কেন মন বসাতে পারেনি। সব সময় এত উদাসীন কেন? হয়ত বা কত মানুষের জীবনে এরকম পরিণতি না-পাওয়া মনের মানুষের ছবি চিরদিন আঁকা থাকে। শুধু সেই মনের মানুষটাই কেবল তা জানে। পৃথিবীর আর কেউ সে খবর পায় না। পাওয়ার কথাও নয়। তাই নন্দিনী পরপারে যেখানেই থাকিস তোর আত্মার শান্তি কামনা করি। বিমলার দু-চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা।

শৈল শহরে নেমে এল রাতের নিকষ কালো গাঢ় অন্ধকার। পাহাড়ি ফুলের গন্ধে ভরা বাতাসে ভেসে গেল স্বজন হারানোর হাহাকারের কান্নার প্রতিধ্বনি। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে অন্য কোনো খানে।

চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্ম - হাওড়া স্টেশন

কল্প ঃ সত্য কাহিনি

অপূর্ব মিত্র

ঘড়িতে সময় তখন ভোর পৌনে তিনটে। মোবাইলের রিংটোনের তীব্র শব্দে ঘুমটা আচমকাই ভেঙে গেল। মোবাইলে চোখ বোলাতেই দেখি মণ্ডলের ফোন। মণ্ডল - 'অপূর্বদা গুড মর্নিং, উঠে পড়ুন। সকাল হয়ে গেছে।' আমি বললাম — শুভ সকাল, ঠিক আছে, উঠছি বলে ফোনটা কেটে দিলাম। মণ্ডল মানে — উত্তম মণ্ডল। বয়স চল্লিশের কোঠায়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল, বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। বেশ চালাক-চতুর ছেলে। শুনেছি একসময় ও নাকি ভালো ফুটবল খেলত। বর্তমানে আমাদের অফিসের ক্যান্টিনটা উত্তমই চালায়। আমাদের অফিসের ফাইফরমাশ খে টে অতিরিক্ত কিছু আয় করে। ব্যাংকের ফাইনান্সে ওর একটা পনেরো 'কেভি এ' ডিজেল জেনারেটর সেট ব্যাংকের কাছে ভাড়াও দেওয়া আছে।

আমি আগের দিনই উত্তমকে বলে রেখেছিলাম ফোন করে ভোরের দিকে আমাকে যেন ঘুম থেকে তুলে দেয়। যাতে অফিসে যাওয়ার জন্য সকালের প্রথম ট্রেনটা ধরতে পারি।

যাই হোক, সেদিনের সকালটা শুরু হল একটু অন্যরকম-ভাবে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দিনটা ছিল রবিবার। সময়টা নোট বন্দি চলাকালীন অর্থাৎ ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরের বেশ কিছুদিন পরে। একে রবিবার ছুটির দিন তায় আবার এতটা সকালে উঠে প্রথম ডাউন ব্যাণ্ডেল - হাওড়া লোকাল ট্রেন ধরতে হবে অফিসের জরুরি কাজ তদারকি করার জন্য। বাড়ি থেকে যখন রওনা দিলাম, বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। ঠান্ডার আমেজটা বেশ বোধগম্য হল। রাতে ঘুম ঠিকমতো হয়নি, তাই যেন একটু বেশি শীত শীত অনুভূত হল। চারদিকটা একেবারে নিস্তব্ধ। ভোরের এই সময়টা পাখি দের কোনো কলকাকলি নেই। ফলে চারপাশের পরিবেশটা একেবারেই শান্ত আর নির্জন।

ট্রেন ধরার জন্য হাঁটা পথে বাড়ি থেকে চন্দননগর স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিলাম। বাড়ি থেকে স্টেশন মিনিট দশেকের পথ। এই সাতসকালে পাড়ার একটা কালো কুকুর আমাকে পথ দেখ ানোর দায়িত্ব নিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। পথের নিশানা ঠিক রাখতে ঠ্যাং তুলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মূত্র ত্যাগ করতে করতে সে আমার সঙ্গে চলল। চলার সময় একটু পরপরই পিছনে ফিরে আমাকে কড়া নজরে রাখছে। আমি ঠিকমতো ওকে অনুসরণ করছি কিনা কালু সেটা চোখের ইশারায় মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এইভাবে নির্জন রাস্তায় বিশ্বস্ত সারমেয়র নজরদারির মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

প্রথমে চন্দননগর থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়া তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেন ধরে টিকিয়াপাড়া যেতে হবে আমাকে। এত ভোরে অফিসে রওনা দেওয়ার কারণ হল আমাদের অফিস বিল্ডিং-এর ভিতরের কাঠামোর আমূল সংস্কারের কাজ চলছিল। ছুটির আগের দিনগুলোতে প্রায় সারা দিনরাত ধরে এই কাজ করা হত। অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, মাঝে মাঝে ছুটির ঠিক আগের রাতগুলো পালা করে দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হবে। পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা অবশ্য থাকবে। সেই নির্ধারিত সূচি মোতাবেক, আগের দিন রাতে যারা অফিস পাহারায় ছিলেন, আমি যাওয়ার পর তাদের ছাড়া পাওয়ার কথা। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, এখানে অফিস বলতে আমি পূর্বের অন্ধ্র ব্যাংক, অধুনা ইউনিয়ন ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া হাওড়া শাখার কথা বলছি। টিকিয়াপাড়ার মনসাতলা, হাওড়া-৫, এই শাখার অবস্থান।

পূর্ব রেলের দিনের প্রথম ট্রেনটা হাওড়ার এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এল। একটু একটু অন্ধকার ভাব আছে। ঘড়িতে সবে ভোর সোয়া চারটে বাজে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শহরতলির ট্রেনগুলো বেশির ভাগ সময় এগারো থেকে চব্বিশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মধ্য থেকেই ছাড়ে। তখন ও পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কোনো ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা না-হওয়ায় আমি সকালের ঠান্ডার আমেজে একটু হেলতে-দুলতে একেবারে গজগামিনী চালেই একনম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে লাগলাম। সেই মুহূর্তের হাওড়া স্টেশন একেবারে জনপ্লাবনহীন। অচেনা এক অদ্ভুত নির্জন পরিবেশ। প্ল্যাটফর্মের বাইরেটা তখনও অন্ধকার কেটে সূর্যের রক্তিমাভা বিকীর্ণ হতে বেশ কিছুটা সময় বাকি। একে তো ভোরবেলা তারপর আজ ছুটির দিন। ফলে বিক্ষিপ্ত অল্প কিছু লোকের আনাগোনা ছাড়া স্টেশনে তেমন একটা ভিড় নেই। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে আমি প্রায় ফাঁকা চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়ালাম।

প্ল্যাটফর্মের মুখটায় একা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। এ সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। চারজন যুবক মিলে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধা মহিলাকে চ্যাংদোলা করে বেশ দ্রুত

গতিতে এগিয়ে নিয়ে এল। তারপর দেখলাম চুপচাপ চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকের একটা কোণায় বৃদ্ধাকে ফেলে রেখে চলে গেল। বৃদ্ধার একেবারেই শীর্ণকায় চেহারা। পরনে ময়লা সাদা কাপড়। বয়স পঁচাশির ওপরই হবে বলে মনে হল। তবে দীর্ঘদিন অপুষ্টিতে ভুগে মনে হয় শরীর শীর্ণকায় হয়েছে। পাশ ফেরার শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছে সে। একেবারেই জুবুথুবু অবস্থা। নিদারুণ করুণ অবস্থা বলতে যা বোঝায় আর কী! শরীরে কেবলমাত্র প্রাণটুকুই আছে বলে মনে হল। এই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে দেখে হকচকিয়ে গেলাম। কৌতূহলবশত আমি নজর করলাম। দেখি বৃদ্ধার চোখের পলক পড়ছে। পিটপিট করে চারদিকে তাকাচ্ছে। আর তন্ন তন্ন করে যেন কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছে। আরও একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ করে বুঝলাম যে, বৃদ্ধা যেন ভালো করেই বুঝতে পারছেন ও বোঝাতে চাইছেন এই পরিবেশ তার একদমই অচেনা ও অজানা। তাঁর এই অসহায় করুণ দৃষ্টির মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল প্রখর জিজ্ঞাসু এক ভাষা। তাকে কেন এখানে আনা হয়েছে? অসহায় অবস্থায়ও চোখের ভাষাটা এমনই স্পষ্ট যেন বোঝাতে চাইছিলেন। হায়! ঈশ্বর কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। কথা বলার শক্তি নেই। কিন্তু তিনি যে একেবারে নিরাশ্রয়, অসহায় হয়ে পড়েছেন তা প্রকাশ পাচ্ছে বেদনাতুর হাহাকারের করুণ চোখের চাউনিতে। এসব দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মনে মনে বললাম হায়! পরমেশ্বর তোমার সৃষ্ট মানব-মানবীর জীবনের অন্তিম লগ্নে এ কী পরিণতি। দিনের শুরুতেই মনটা বিষাদময় হয়ে গেল।

এই সময় চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মেই একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। প্রচুর ভিড়, লোকেলোকারণ্য হয়ে গেল। সকলের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু সহায়সম্বল হীন বৃদ্ধার দিকে ঘুরে-ফিরে নিজের অজান্তেই তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলাম। আমার চোখটা কেমন যেন ওই বৃদ্ধার চোখের মণিতে আটকে গিয়েছিল। অশীতিপর বৃদ্ধা তখন শুয়ে শুয়ে কেবল যাত্রীদের সারা শরীরের দিকে লম্বালম্বিভাবে দেখছেন আর সকলের আনাগোনা বেশ পিটপিট করে লক্ষ করে চলেছেন। মনে হল যেন ভিড়ের মধ্যে কোনো প্রিয়জনকে খোঁজার চেষ্টা করছেন। জনারণ্যে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হল।

চারদিকে যাত্রীদের চলাচলের শুধুমাত্র জুতো ঘষার একঘেঁয়ে জোরালো খ্যাসখ্যাসে শব্দ আর তার সঙ্গে মাইকে ট্রেন চলাচলের ঘন ঘন তীব্র ঘোষণার আওয়াজ কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। মনে হল এই মুহূর্তে সকালের শান্ত নির্জন পরিবেশটা একেবারে নরকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে অগণিত মানুষ একের-পর-এক চলাচলের কারণে বৃদ্ধার দৃষ্টি সবার মুখ পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছিল না বলে মনে হল। অবশ্য পৌঁছোনোর কথাও নয়। কারণ ওঁর যে অবস্থা সেটা সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থে তিনি যে একেবারেই অথর্ব ও অসহায় এক হতভাগ্য বৃদ্ধা।

একটু ভিড় কমতেই বিষণ্ণ মন নিয়ে আমিও ফিরতি ট্রেন ধরে আমার ব্যাংকের ব্রাঞ্চের উদ্দেশে রওনা দিলাম। ট্রেনে বসে ভারাক্রান্ত মনে কত ধরনের ভাবনার উদয় হল। মনে মনে উপলব্ধি করলাম মানুষের জীবনের শেষ দিনগুলো সত্যিই এতটা ভয়ংকর। দীর্ঘ জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে যখন মানুষের আর চলাফেরার ক্ষমতা থাকে না তখন তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করে করুণার পাত্র হয়ে দিন কাটাতে হয়। সেসময় কেউ কেউ হয়ত পরিবারের কাছে ভালো ব্যবহার পায়। কিন্তু অনেক সহায়সম্বলহীন অর্থব মানুষদের হয়ত বা বৃদ্ধার মতো এই পরিণতি হয়।

(২)

মনটা যেন একটু দার্শনিক হয়ে গেল। মনে মনে বললাম আমরা কেউ চিন্তা করি না যে একদিন আমাদের জীবনেও এই অবস্থা হয়তো হতে পারে। বেশ কয়েকদিন ধরে টিকিয়াপাড়া রেল কালভার্টের নিচে এক ব্যক্তিকে শুয়ে থাকতে দেখতাম। হয়ত কোনো ভালো পরিবারের সদস্য। কিন্তু পরিবারে ওই ব্যক্তির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই হয়ত তাকে পারিবারিক অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল-এর মতো তাঁকে এখানে ছুড়ে ফেলে চলে গেছে। সময়ের কিছুটা আগে জোর করেই বানপ্রস্থে পাঠানো আর সেখানে চিরমুক্তি লাভের অপেক্ষা। এরকম কতশত ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। আর আমরা মানবিকতা হারিয়ে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি অন্ধকারের দিকে। এসময় ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গান মনে পড়ল। 'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ...।' দুর্ভাগ্যবশত আমার আবেগপ্রবণ মন তাই হয়ত প্রতিনিয়ত এইসব করুণ দৃশ্য চলার পথে আমার নজর এড়িয়ে যেত না।

প্রথম প্রথম লক্ষ করতাম কালভার্টের নিচে শুয়ে থাকা লোকটি প্রৌঢ় হলেও একেবারে অথর্ব ছিল না। তিনি একটু লুঙ্গিও পরিষ্কার জামাকাপড় পরতেন। একটা নতুন মাদুরে শুয়ে থাকতেন। মাথার ধারে মুড়ির প্যাকেট ও পাকা কাঁঠালি কলার ছড়া থাকতেও দেখেছিলাম। প্রৌঢ় মানসিকভাবে অসুস্থ হলেও আপাতদৃষ্টিতে সেটা একদম বোঝার উপায় ছিল না। অফিসে

যাতায়াতের পথে লক্ষ করতাম তিনি অসহায় অবস্থায় মাঝে মাঝে উঠে বসে আছেন আবার একটু হাঁটাচলাও করছেন। রাত কীভাবে কাটাতেন তা আমার জানা নেই। দেখতে দেখতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ওই নোংরা, নর্দমা পুতিগন্ধময় পরিবেশে থাকায় তার জামাকাপড়ও নোংরা ময়লা হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। তারপর এই নারকীয় পরিবেশের মায়া কাটিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই যা হওয়ার তাই হল। ... কেবল... পড়ে রইল সঙ্গীহীন মাদুরটা। আবার মনে পড়ল, 'আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে ... দেখি মুকুট টাতো পড়ে আছে রাজাই শুধু নেই।' ওই শূন্য কালভার্টের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে।

কেন জানি না, সেদিনের হাওড়া স্টেশনের ওই নিঃস্ব অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখার বেদনাদায়ক স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। আমি তো তাকে কোনো সহায়তার হাত বাড়িয়েও দিতে পারিনি। সে সুযোগও আমার ছিল না। তাই মনটা সারাক্ষণ কেমন যেন অশান্তিতে ছটফট করতে লাগল। নানান ধরনের কাল্পনিক চিন্তাভাবনা মনে হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম ওই বৃদ্ধার ফেলে আসা শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল আর এখন বার্ধক্যের পরিণতির কথা। ... হায় রে জীবন! প্রথম জীবনে শৈশবকালে ওই মহিলা হয়ত যৌথ পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেশ হাসিখুশিতে সুস্থ সবল ভাবে সবার আদরে বড়ো হয়েছেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে স্কুলজীবনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সুন্দর রঙিন জীবন কাটিয়েছেন। যৌবনে পা দিয়ে আর সব নরনারীদের মতো রঙিন স্বপ্নের জগতে হয়ত বিচরণ করেছেন। উড়ু উড়ু মন নিয়ে হয়তো কোনো মনের মানুষের মনে স্বপ্নের রানি হয়েছিলেন। নয়তো বা তা কোনোদিন হয়নি। কারণ বৃদ্ধার বর্তমানে যা বয়স তা সেসময়কার কঠোর রক্ষণশীল সমাজে হওয়া সম্ভবও ছিল না। তাই প্রেমে পড়ে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। আর তৃতীয় পর্বে বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হওয়া। এই সাংসারিক জীবন হয় ভীষণ সুখের ছিল নয়ত বা অতি আকাঙ্ক্ষার অভিলাষে বিপথগামী হওয়া। এভাবে জীবনটা এলোমেলোও হতে পারে। কোনো এক সময় হন স্বামীহারা। শুরু হয় বৈধব্য জীবন। জীবনে নেমে আসে একাকীত্ব। এরপরে পুত্রের সংসারে কিংবা মেয়ে-জামাই-এর সংসারে ঠাঁই নেওয়া। হয় সুখে-শান্তিতে থাকা নয়তো সকলের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে শরীরের দিকে নজর না-দিয়ে কর্মক্ষমতা হারানো। কাজ না-করতে পারলে সকলের চক্ষুশূল হওয়া। সময়ের চলমান গতিতে ধীরে ধীরে অক্ষম হয়ে সবার কাছে বোঝা হয়ে পড়া ইত্যাদি কারণে সংসারে অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠা মানুষের চূড়ান্ত অবহেলায় পুত্র বা জামাইয়ের হাত ধরে বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই পাওয়া। এরপর ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জীবনের শেষ লগ্নে এসে এই জনারণ্য হাওড়া প্ল্যাটফর্মের ডাস্টবিন তুল্য প্ল্যাটফর্মের এক কোনায় ঠাঁই পাওয়া। এইসব সাতপাঁচ ভেবে ভেবে মাথা ধরে গেল। মনে মনে শুধু ভাবছিলাম মানুষের অমূল্য জীবন কীভাবে অনাদরে, অবহেলায় শেষ হয়ে যায়। একটু ভালোবাসা আর মানবিকতার ছোঁয়া পেলে কত জীবন আমাদের এই চলমান সংসার-জীবনের আলো, আনন্দভরা বাগানে ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু ভালোবাসার ছোঁয়া-বঞ্চিত বৃদ্ধার ওই জীবন নিষ্ঠুর দুঃখের বিষণ্ণতায় ভরা।

অফিসে এসে চুপচাপ বসে রইলাম।

মণ্ডল এসে বলল - কী হল অপূর্বদা একেবারে যে চুপচাপ। আমরা অফিসে রাত জাগলাম আর আপনি ঝিমিয়ে আছেন।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তবে উত্তম চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। মিস্ত্রিরা মজা করে গান গাইতে গাইতে জোর কদমে তাদের কাজ করে যাচ্ছে।

বেশ কিছুটা পর ধাতস্থ হয়ে আমি বললাম — মনটা একেবারে ভালো নেইরে কারো সঙ্গে কথা বলতে একদমই ইচ্ছা করছে না।

কারও সঙ্গে সারাদিন বিশেষ কোনো কথাবার্তা হল না। কখন যে সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল ঠিকমতো মালুম হল না। এবার আমারও বাড়ি ফেরার পালা।

(৩)

ফেরার ট্রেনটা হাওড়া স্টেশনের পনেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিল। এই পনেরো নম্বর পেরিয়ে চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসতে হয়। গভীর অবসাদে ভরা বিষণ্ণ মনের গভীরে তখন নীরবতার এক মহাসমুদ্র। কৌতূহলবশত বৃদ্ধাকে দেখার জন্য মনটা যেন একটু বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি ট্রেনের শেষের কামরায় উঠেছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে রণ পায়েই সকালের দেখা চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মের বুড়ির শুয়ে থাকা স্থানের দিকে চলতে শুরু করলাম। আমাকে কোনো অদৃশ্য চুম্বক শক্তি যেন ওই দিকে টেনে নিয়ে গেল। দূর থেকে কোনো জটলা তখনও চোখে পড়েনি। আমার শরীরে মনে হল একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। শরীর অবশ হয়ে আসছে। কোনো জোর পাচ্ছি না। ভিতরে ভিতরে নিজের অজান্তেই চাপা কান্নার গুঞ্জন চলতে লাগল। তবুও ভগ্ন হৃদয়ে এগিয়ে চললাম। চোদ্দো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে এদিক-ওদিক তন্ন

তন্ন তন্ন করে বুড়িকে খুঁজতে লাগলাম। যাত্রীরা যে যার মতো একে একে সবাই এগিয়ে গেল। উদগ্রীব হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে নজরে পড়ল সাদা কাপড়ে ঢাকা এক বস্তুর দিকে। আর পাশে বসে একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মাটিতেই বসে আছে। আমার এতক্ষণ ধরে দেখতে না-পাওয়ার কারণ আমি আমার অজান্তে খুঁজছি সেই গভীর অসহায় আকুল চোখ দুটি। আমি বুড়িকে একেবারেই খুঁজছিলাম না। কেন-না বুড়ির ওই নিদারুণ করুণ আকুল চাউনি ছাড়া ওঁর মুখমণ্ডলের রূপ যে আমার একেবারেই মনে নেই। পরক্ষণে ওই সাদা কাপড় ঢাকা শরীরটা দেখে থম্বিৎ ফিরল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম — 'কে হন উনি তোমার?'

মেয়েটি উত্তর দিল — 'দিদা।'

আমি জানতে চাইলাম উনি কোথায় ছিলেন?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। মুখটা কেবল ঘুরিয়ে নিল। মনে হল আরও কারও জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে। এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মের এত কোলাহলের কোনো আওয়াজই যেন আমার কাছে পৌঁছোচ্ছিল না। হঠাৎ-ই মাইকে ট্রেন ছাড়ার ক্ষীণ ঘোষণা আমার কানে ভেসে এল।

সাতটা পঁচিশের কাটোয়া লোকাল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। আমি ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পেতে লাগলাম। আর নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললাম দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে।

রাজনীতির গল্প ব্যাসকৃত মহাভারত ও বর্তমান প্রেক্ষিত

অধ্যাপক ড.দেবদাস মণ্ডল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ। যুধিষ্ঠিরের এখন রাজা হওয়ার পালা, কিন্তু তিনি রাজা হতে চাইছেন না। সকলেই তাঁকে বোঝাচ্ছেন — ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী, ব্যাস এমনকি, শ্রীকৃষ্ণও, কিন্তু কারোর কথায় তিনি রাজি নন। শেষপর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে পিতামহ ভীষ্মের কাছে, যেখানে তিনি শরশয্যায় শায়িত। পিতামহ ভীষ্ম রাজনীতি জগতের প্রবাদপুরুষ। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রবর্তিত প্রথম রাজনীতিশাস্ত্র পৈতামহতন্ত্র থেকে শুরু করে বৈশালাক্ষতন্ত্র, বাহুদন্তকতন্ত্র, বাহস্পত্যতন্ত্র, ঔশনসতন্ত্র, এমনকি মানবী অর্থবিদ্যা, ভারদ্বাজনীতি, কালকবৃক্ষীয় নীতি সবই তাঁর ধাতস্থ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগতে রাজনীতির সূর্য অস্তমিত হবে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। ভীষ্ম জগতে ধর্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই একমাত্র পারবেন যুধিষ্ঠিরের সন্ন্যাসধর্ম থেকে নিবৃত্ত করে রাজধর্মে প্রবর্তিত করতে। যুধিষ্ঠিরের আগমনের হেতু শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভীষ্ম এখন তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা মুক্ত হয়ে পূর্বের স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বোঝাচ্ছেন—ক্ষত্রিয় হিসেবে তাঁর সমস্ত শোক ভুলে গিয়ে রাজা হওয়া এবং রাজধর্ম পালনের গুরুত্বের কথা। রাজধর্ম সর্বধর্মের মূল, রাজধর্ম আছে বলেই তো জগতে সমস্ত ধর্ম টিকে আছে। রাজধর্ম প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের জানা-অজানা কত প্রশ্ন, কত সংশয় কী নেই সেখানে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি, গাহস্থ্যধর্ম, আপদ্ধর্ম, এমনকি মোক্ষধর্মও, সবকিছুই একের-পর-এক কৌতূহলের সমাধান করেছেন পিতামহ। রাজধর্মের তাত্ত্বিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি যাতে পরিষ্কার হয়, সেজন্য বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে তা বোঝাতে চেয়েছেন। আজকের যুগে রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে যখন প্রায় সকলে দিশেহারা, তখন পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে প্রদত্ত এমন রাজনৈতিক তত্ত্বসমৃদ্ধ দুটি গল্প এখানে তুলে ধরা হবে, যে গল্প দুটি রাজার কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ক হলেও বর্তমান প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এযুগের সমৃদ্ধিকামী রাজনৈতিক নেতাদের বা রাজনৈতিক দলের আচার-আচারণ ও রীতিনীতি জানার ক্ষেত্রেও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন — এই জগতে যাঁরা পরিণামদর্শী এবং প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁরাই অনায়াসে উন্নতি লাভ করতে পারেন। আর যাঁরা দীর্ঘসূত্রী তাঁরা অচিরেই বিনষ্ট হন। এই কথাটা যে কতটা ধ্রুব সত্য, তা বোঝা যাবে 'পরিণামদর্শী- প্রত্যুত্পন্নমতি এবং দীর্ঘসূত্রী এই তিন শকুল মাছের উপাখ্যান' থেকে।[২] আলোচ্য তিন মাছের কাহিনি পঞ্চতন্ত্র-এর 'মিত্রভেদ'-এর ১৪ সংখ্যক কথার সঙ্গে মিল থাকলেও সেখানে মাছের নামের (অনাগতবিধাতা-প্রত্যুত্পন্নমতি-যদ্ভবিষ্য)[৩] সঙ্গে আলোচ্য গল্পে মাছের নামের যেমন কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কী জাতের মাছ, তার নির্দেশ সেখানে নেই। মহাভারত-এ যে তিনটি মাছের কথা বলা হয়েছে তারা হল 'শকুল' অর্থাৎ শোল মাছ। এরা খুব গভীর জলের মাছ, জিওল প্রকৃতির মাছ, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় এরা যেমন সহজে মরে না, তেমনি তারা সাধারণত কর্দমাক্ত জলে কিংবা পাঁকে থাকতে বেশি ভালোবাসে। এককথায় গভীর জলের মাছ হলেও ডাঙায় চলতেও তারা বেশ অভ্যস্থ তাদের গা অতি পিচ্ছিল হওয়ায় সহজে ধরাও মুশকিল। যাই হোক, ওই সব মাছ ধরার আশায় একদিন যখন জেলেরা জলাশয়ে জাল ফেলা বা জল নিঃসারণের কথা বলেন, তাতে অতিশয় ভীত হয়ে পরিণামদর্শী তার অন্য বন্ধু শকুলদের সময় থাকতে ভিন্ন জলাশয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।[৪] মনে হয়, একজন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মতই দূরদর্শী ভাবনা থাকায়, এই মাছের নাম হয়েছিল 'পরিণামদর্শী'। পরিণামদর্শীর নীতিশাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তার বক্তব্য থেকে। তার মতে—'যিনি সময় থাকতে সুকৌশলে ভাবী বিপদের প্রতিকারের উপায় বের করেন, জীবনে তিনি কখনোই সংশয়াপন্ন হন না।'[৫] এই বলে সে কোনোরকম দেরি না-করে তৎক্ষণাৎ জল নিঃসরণের স্রোতের সঙ্গে ভিন্ন (নিরাপদ) জলাশয়ে চলে যায়।

বস্তুত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে, শত্রু জেলেদের জালফেলার ভয়ে পরিণামদর্শীর স্বস্থান ছেড়ে এরূপ ভিন্ন স্থানে গমনকে যাড্গুণ্যের অন্যতম নীতি যান

বলে নির্দেশ করা হয়। সাধারণত যান বলতে পররাজ্য গ্রাসের নিমিত্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানকে বোঝায়।[৬] তবে যান যে কেবল যুদ্ধের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে গমন নয়, বলবান শত্রুর ভয়ে দুর্বল ব্যক্তির (বিজিগীষুর) নিজের প্রাণ বা অর্থ রক্ষার জন্য অন্যত্র পলায়নকেও যান বোঝায়, তা জানা যায় পঞ্চতন্ত্র থেকে। সেখানে দু-প্রকার যানের কথা বলা হয়েছে — ১. শত্রুর প্রতি যুদ্ধের জন্য গমন ২. অপসারণ অর্থাৎ পলায়ন।[৭] এক্ষেত্রে তাই পরিণামদর্শী সময়-সুযোগ বুঝে পলায়নরূপ যাননীতি অবলম্বন করেই আসন্ন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। পরিণামদর্শী-র মতো প্রত্যুত্পন্নমতি-ও যান-নীতি গ্রহণ করেছিল ঠিকই, তবে সে বোধ হয়, শেষপর্যন্ত বর্তমান স্থানের সুবিধাটুকু নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আসন-নীতি অবলম্বন করে স্বস্থানে থাকা সম্ভব মনে হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যুত্পন্নমতি সেই জলাশয়েই থেকেছে। কিন্তু জলাশয়ের জল যখন ক্রমশ কমে গেছে, যখন জেলেরা দীর্ঘসূত্রী সহ সকল মাছদের মুখে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে তখন বাঁচার আর অন্য কোনো পথ না-পেয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি (উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে) স্বেচ্ছায় ওই সব মাছের মধ্যে ঢুকে দড়ি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছে। যাতে তাকে স্বতন্ত্রভাবে কেউ বুঝতে না-পারে। সমস্ত মাছ-ই সংগ্রহ করা হয়েছে ভেবে জেলেরা যখন মুখে দড়ি বাঁধা মাছগুলিকে নিয়ে অন্য জলাশয়ে ছেড়ে দেয়, তখন প্রত্যুত্পন্নমতি মুখের দড়ি ছেড়ে দিয়ে সেই মুহূর্তে গভীর জলে চলে গেছে। তার গোপন অভিসন্ধি কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। আর দীর্ঘসূত্রী স্বস্থানে অবস্থান করায় (আসন-নীতি) বা কোনো চেষ্টা না-করে শুধু দৈবনির্ভরশীল হওয়ায় আর পাঁচটা সাধারণ মাছের মতো শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, যাঁরা মোহবশত সাক্ষাৎ কাল উপস্থিত হয়েছে, তাও বুঝতে পারেন না বা সতর্ক করলেও যিনি উদাসীন কিংবা নিষ্ক্রিয় থাকেন, দীর্ঘসূত্রীর ন্যায় দিনের-পর-দিন ভাবতে ভাবতে তাঁরা একসময় শুকিয়েই মরেন। আর 'আমি সর্বকর্মে নিপুণ'— এইরূপ যাঁরা ভাব করেন, প্রত্যুৎপন্নের ন্যায় (উপস্থিত বুদ্ধির জোরে) তাঁরা হয়তো সমৃদ্ধিলাভ করেন ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় তাঁদের জীবন সংশয়াপন্নও হয়ে থাকে। আর বিপদ আসন্ন বুঝে সময় থাকতে যাঁরা পথ বেছে নেন, পরিণামদর্শীর মতো তাঁরাই অনায়াসে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারেন।

সমৃদ্ধিকামী রাজার উদ্দেশে প্রদত্ত ভীষ্মের এই উপদেশ আজকের যুগে সুবিধাবাদী দলবদলু রাজনৈতিক নেতাদের কিংবা ধুরন্ধর কালোবাজারি (মাফিয়াদের আচরণের সঙ্গে যেন অদ্ভুতভাবে মিলে যায়, যাঁরা সমস্ত নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ভাবনায় কিংবা পিঠ বাঁচানোর দায়ে যখন যে-দল ক্ষমতায় আসে, সুযোগ বুঝে সেই দলে চলে যান। এঁদের মধ্যে একশ্রেণি আছেন, যাঁরা পরিণামদর্শীর মতো জেলেদের জালে আটকানোর ভয়ে (অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্তরা সিবিআই প্রভৃতি তদন্তকারী সংস্থার জালে জড়ানোর ভয়ে) কিংবা জলাশয়ের জল কমে যাচ্ছে (দলের প্রতি জনগণের ভালোবাসা বা আস্থা কমে যাচ্ছে) বুঝে আগে থেকে নিরাপদ (গভীর জলাশয়ের মতো) স্থানে (দলে) সরে পড়েন। আর (মধ্যবর্তী) প্রত্যুৎপন্নমতির মতো এক শ্রেণিরা থাকেন, যাঁরা (মুখে দড়ি কামড়ে থাকা মাছের ন্যায়, বাঁধা নয়) মুখে মুখে দলের বড়ো আনুগত্য দেখান, অথচ মনে থাকে গভীর অভিসন্ধি। দলের শেষ পরিস্থিতি না-বোঝা পর্যন্ত তারা সেখানে বশ্যের ন্যায় পড়ে থেকে সমস্ত সুবিধা ভোগ করেন, এবং শেষমুহূর্তে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি খাটিয়ে অতি সুকৌশলে (রঙ বদলে) অনুকূল দলে ভিড়ে গিয়ে পিঠ বাঁচান। দীর্ঘসূত্রী বা যত্তবিষ্যের ন্যায় অবশিষ্ট আরেক শ্রেণি যাঁরা আছেন, তাঁরা যা হওয়ার তাই হবে ভেবে ভেবে শুধুই নীতি-নৈতিকতার দোহাই দিয়ে, দিনের-পর-দিন বিনা চেষ্টায় পড়ে থাকেন, এবং সেভাবেই পিষ্ট হতে হতে একসময় বিনষ্ট হন (যদি কাকতালীয় কিছু না-ঘটে); এ জীবনে সুদিন তাঁদের কোনোদিনই আসে না।

২. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার শেষ নেই। পিতামহ ভীষ্মের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—হে ভারতশ্রেষ্ঠ; কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আপনি একমাত্র বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বললেন। আর সেই বুদ্ধি—অনাগতা, প্রত্যুৎপন্না ও বিনাশিনী (দীর্ঘসূত্রী) ভেদে ত্রিবিধা, এবং এদের মধ্যে দীর্ঘসূত্রী যে বিনাশের হেতু তাও বোঝালেন। এবার আপনি সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধির কথা বলুন, যে বুদ্ধির জোরে রাজা শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থাতেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। কিংবা বহুশত্রু মিলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অসহায়, একাকী ব্যক্তি (রাজা)-কে উৎখাত করার চেষ্টা করলে কীভাবে

তিনি নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন? আর, কী প্রকারেই বা তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসবেন? শত্রু ও মিত্রের মধ্যে বিরাজমান বিজিগীষুর আচরণ কী হবে? একদা শত্রু কোনো কারণে পরবর্তীকালে মিত্র হলে তার সঙ্গে বিজিগীষুর আচরণ কী হবে? ইত্যাদি।

বস্তুত, এখানে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের অভিমুখ যেন রাজনীতির সাধারণ ক্ষেত্র থেকে একেবারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত, সেখানে পাওয়া যাবে শত্রু-মিত্রের প্রাথমিক ধারণা থেকে শত্রু-মিত্র পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাজমণ্ডলের মধ্যে (আন্তর্জাতিক স্তরে) বিরাজমান বিজিগীষুর কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক ধারণাও। বিশেষত, চতুর্দিক শত্রুপরিবেষ্টিত হয়েও কীরূপ কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে দুর্বল বিজিগীষু নিজের সুরক্ষায় সমর্থ হবেন? কূটনীতির এইসব তাত্ত্বিক বর্ণনা সাধারণত পাওয়া যায় ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রাদিতে। পিতামহ ভীষ্ম সেইসব কূটনৈতিক জটিল তত্ত্ব এখানে 'ইদুর ও বিড়াল সংবাদ'—এই কাহিনির মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে সহজে বুঝিয়েছেন।

এক মহাঅরণ্যে লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন এক বিরাট বট গাছ, যে গাছের চতুর্দিকে প্রসারিত বিশাল বিশাল শাখাপ্রশাখার শীতল ছায়ায় বাস করত নানা ধরনের পশুপাখি। আর, এই গাছের একেবারে মূলদেশে থাকত পলিত নামে এক ইঁদুর। 'পলিত' শব্দের আভিধানিক অর্থ grey, hoary, grey-haired, old, aged (V.S. Apte, p. 327) অতএব, ধূসর লোমের কারণেও তার এই নাম হতে পারে। আবার 'পলিত' বলতে পক্বকেশকেও বোঝায়। তবে শুধু বয়সের কারণে সে যে পলিত (পক্বকেশ) তা নয় তার বুদ্ধিটাও বোধহয় বেশ পাকাই ছিল (পাকামাথা) যা তার নামের পাশে মহাপ্রাজ্ঞ—এই বিশেষণ থেকেই বোঝা যায়। পলিত কেশ ইঁদুরের জয়ের বাসনা বর্তমান, উৎসাহ গুণসম্পন্ন, তাই এখানে তাকে বিজিগীষু হিসেবেই ভাবতে হবে। তবে তার অমাত্যাদি প্রকৃতির কোনো উল্লেখ নেই, তাই তাকে ধরতে হবে দুর্বল বিজিগীষু হিসেবে। অর্থশস্ত্র-এ অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের পাশাপাশি বিজিগীষুর নীতিজ্ঞানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৮] প্রসঙ্গত, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে বিজিগীষুর লক্ষণটি একবার স্মরণ করে নিতে হবে, যিনি দ্রব্যপ্রকৃতিসম্পন্ন, উৎসাহযুক্ত, পরিশ্রমী, জয়ের বাসনা যাঁর স্বভাবে বর্তমান তিনিই হলেন বিজিগীষু।[৯] সেখানে শত্রুর লক্ষণে বলা হয়েছে একই বিষয়ের প্রতি যাঁদের অভিলাষ থাকে, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু।[১০] লক্ষণীয়, রাজশাস্ত্রাদিতে রাজমণ্ডল কল্পনায় রাজচক্রবর্তীর ক্ষেত্রে বিজিগীষুকে ঠিক মাঝখানে রেখে তাঁর সামনে ও পিছনে অরি, মিত্র, প্রভৃতি দ্বাদশরাজমণ্ডলের রাজাদের অবস্থান এবং মধ্যম, উদাসীন, অরি ও বিজিগীষুকে মূল প্রকৃতি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।[১১] আলোচ্য গল্পেও ঠিক তেমনি বিজিগীষু হিসেবে ইঁদুরকে গাছের একেবারে মূলদেশে অর্থাৎ কেন্দ্রে রেখে ওই বিশাল শাখাপ্রশাখাযুক্ত বট গাছকে ধরা হয়েছে রাজচক্রবর্তী ক্ষেত্রের প্রতীক হিসেবে, তার চতুর্দিকে প্রসারিত শাখাপ্রশাখা গুলি ছিল তাই অরি-মিত্র-উদাসীন প্রভৃতির বসতিযুক্ত এক-একটি দেশের মতোই। রাজমণ্ডলে শত্রু-মিত্রের সহাবস্থানে বিজিগীষু বিরাজ করলেও বলবান শত্রুর ভয়ে সর্বদা সুরক্ষিত থাকতে দুর্গ পরিপাটির ব্যবস্থা থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই বোধহয় চারদিকে শত্রুর উৎপাতের ভয়ে ইঁদুরেরও সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শতমুখযুক্ত বিলদুর্গ অর্থাৎ গর্ত। নীতিশাস্ত্রাদিতে অসংখ্য দ্বারবিশিষ্ট দুর্গকে প্রশস্ত দুর্গ বলে মনে করা হয়, এখানে ইঁদুরের বিলদুর্গটিও ছিল শত মুখবিশিষ্ট, অর্থাৎ বেশ প্রশস্ত।[১২] যেখানে সে স্বচ্ছন্দে বা নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে। আলোচ্য গল্পে বিজিগীষু হিসেবে যদি ইঁদুরকে ধরা হয়, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী শত্রু থাকাটা স্বাভাবিক। ইঁদুরের একেবারে সহজাত শত্রু হিসেবে বট গাছের ডালেই থাকে এক ভয়ংকর গেছো বিড়াল। বিড়ালের নাম লোমশ, অর্থাৎ যার গায়ে লোম ভর্তি। মনে হয়, গাছে পাখিদের ডিম-বাচ্চা খেয়ে খেয়ে সে বেশ মোটাসোটাই হবে অর্থাৎ সামর্থ্যসম্পন্ন। এরূপ শত্রুকে রাজনীতিশাস্ত্রে দুশ্ছেদ্যশত্রু বলে ধরা হয়ে থাকে।[১৩] বিজিগীষু গুণযুক্ত বা তদধিক গুণসম্পন্ন হওয়ার কারণে তাকে সংহার করা খুবই কষ্টকর। শুধু তাই নয়, তার থেকে সর্বদা ভয়ে ভয়েও থাকতে হয়। কারণ, যে-কোনো সময় আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। পার্শ্ববর্তী ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র থাকলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের রাজার মনে ঠিক যে অবস্থা হয় আর কি। বস্তুত, এখানে দুর্বল (ইঁদুর) বিজিগীষুর পার্শ্ববর্তী বলবান শত্রুর (বিড়ালের) অবস্থান নির্দেশ করা হল। ইঁদুর যে সবসময় বিড়ালকে ভয়ে করে চলে, এটা কারোরই অজানা নয়। অর্থাৎ কঠোর বাস্তব থেকেই যে গল্পের ভাবনা উঠে এসেছে

তা এখানে পরিষ্কার। সেখানে এক চণ্ডালও আছে, যে সম্প্রতি পশুপাখি ধরার জন্য রাত্রিতে এসে জাল, কূটযন্ত্র (ফাঁদ) পেতে রাখে। সেই জালে বহু পশুপাখি আবদ্ধ হয়, আর শত্রু চণ্ডাল দিনের বেলা তাদের ধরে নিয়ে যায়। এখানে বিড়াল যেমন ইঁদুরের শত্রু, তেমনি বিড়ালের শত্রু হিসেবে আছে চণ্ডাল। মনে হয়, বিজিগীষু ইঁদুরের দিক থেকে সে উদাসীন, যেহেতু সে এই চত্বরের (বিজিগীষু ভূম্যন্তর) বাহিরে থেকে আগত। অতি সাবধানে থাকা সত্ত্বেও কোনোক্রমে একদিন ইঁদুরের মহাশত্রু সেই বিড়াল ওই চণ্ডালের জালে আবদ্ধ হয়। এতক্ষণে বোঝা গেল, গল্পের সূত্র ধরে আমরা প্রবেশ করেছি রাজনীতির আঙিনায়। আর এখান থেকেই ক্লাইম্যাক্সের শুরু।

রাজনীতিতে বলবান শত্রু যখন অপেক্ষাকৃত বলীয়ান শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন তখন দুর্বল বিজিগীষু যেমন কিছুটা আশ্বস্তবোধ করেন, ঠিক তেমনি আলোচ্য গল্পেও দেখা যায় এতদিনকার মহাশত্রু বিড়াল যখন চণ্ডালের জালে আবদ্ধ হয়, তখন পলিত কেশ ইঁদুর হয়তো কিছুটা আশ্বস্ত হয়েই নিজের গর্ত (দুর্গ) থেকে একটু খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। বস্তুত, বিড়ালের জালে আবদ্ধ হওয়ার পর ইঁদুরের এই খাদ্যের সন্ধানে বের হওয়া যেন শত্রুর অগোচরে/দুর্বলতার সুযোগে দুর্বল বিজিগীষুর তলে তলে (মিত্র) শক্তি সন্ধান করে নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার মতোই। কিন্তু তা যখন সম্ভব হয়নি, শেষপর্যন্ত সে সহাস্যে কূটযন্ত্রে উঠে জালে আবদ্ধ বিড়ালের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, যার উদ্দেশ্য হয়তো ছিল শত্রু দুর্বলতার সুযোগ তাকে সংহার (বিগ্রহ) করে নিজের পথ পরিষ্কার করা, বা নিজে সমৃদ্ধ হওয়া। কিন্তু, পরিস্থিতি তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে। পরিস্থিতি অনুসারে সে বাধ্য হয়েছে শত্রুকে সংহারের (বিগ্রহের) পরিবর্তে তার সঙ্গে সন্ধির ভাবনা ভাবতে। কেন-না, বিচক্ষণ ইঁদুর জালেবদ্ধ বিড়ালের মাংস খেতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে চারদিকে একটু দেখে নিতে গিয়ে যা দেখে, তাতে শুধু সে হতাশই হয়নি, বরং সে বুঝেছে বর্তমানে সে নিজেই ঘোর সংকটাপন্ন। অর্থাৎ, সে নিজেই বধ্য হওয়ার নিমিত্ত অপরাপর (মধ্যম-গোছের) শত্রুদের তীক্ষ্ণ নজরে রয়েছে। তার বাসভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী তাম্রলোচনযুক্ত, শর (তৃণ) ফুলের ন্যায় রঙবিশিষ্ট, অতি ধূর্ত, মহাভয়ংকর এক শত্রু বেজি তাকে লক্ষ করে মুখ উঁচু করে বসে আছে। যেহেতু পাশে বিড়াল আছে তাই সে (বেজি) কিছু করতে পারছে না। ওই বেজির নাম ছিল হরিণ, ঘাসের মধ্যে দ্রুত বিচরণে সমর্থ হওয়ায় কিংবা ঘেসো ঘেসো রঙ হওয়ার কারণে তার ওইরূপ নামকরণ হয়েছে মনে হয়। আবার বট গাছের ডালে থাকা বিড়ালের প্রতিবেশী গাছের কোটরে বসবাসকারী তীক্ষ্ণ চক্ষুবিশিষ্ট নিশাচরী আর এক শত্রু আছে — প্যাঁচা, সেও ইঁদুরকে খাবে বলে এখন বৃক্ষের শাখায় এসে হাজির। প্যাঁচার নাম চন্দ্রক। মনে হয়, কেবল রাত্রেই তার আবির্ভাব, কিংবা গায়ের রঙ ধপধপে সাদা হওয়ায় তার এরূপ নামকরণ। এখন, একবার দেখে নেওয়া যাক, ইঁদুরের বর্তমান অবস্থানটা মোটামুটি কেমন—

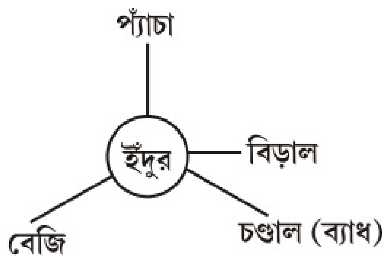

অর্থাৎ ইঁদুর যেন একেবারে জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো মারাত্মক অবস্থার মুখোমুখি। সামনে-পিছনে, উপরে সবদিকেই তার শত্রু। সুমহদ্ভয়ম্ — মহাভয় উপস্থিত। এইরূপ চক্রব্যূহের মধ্য থেকে সে কীভাবে মুক্ত হবে, পালিতকেশ ইঁদুরের এই হয়েছে চিন্তা। এতকাল তার যে একেবারে কোনো শত্রু ছিল না, তা নয়, কিন্তু এরকম মহাসংকটে সে আগে কখনও পড়েছে বলে মনে হয় না। যদি সে তার ভূমি (দুর্গ) না-ছেড়ে এভাবে বিড়ালকে খেতে না-যেত, তাহলে হয়তো এরূপ বিপদে সে কখনোই পড়ত না। এখন তার প্রাণে বেঁচে থাকা যেন দায়; অর্থাৎ তার অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত। এখানে প্রশ্ন, ইঁদুরকে যদি বিজিগীষু-ই ভাবা হয়, অজেয়কে জয় বা শত্রুকে জয়ের বাসনা যদি তার মনে থাকে, তাহলে শত্রু বিড়ালের দুর্বলতার সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করতে যাওয়াটা দোষের কোথায়? রাজশাস্ত্রাদিতে তো শত্রুর দুর্বলতা বুঝলে স্থান-কাল বিবেচনা না-করে যে-কোনো সময়ই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার (যান) নির্দেশ আছে। তাই সে যে একেবারেই (ঐতিহাসিক) ভুল করেছে — এটা হয়তো নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতি হল এই — যদি সে বিড়ালকে খাওয়ার

আশা ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে তাহলে তাকে বেজিতে খাবে, আবার বর্তমান স্থানে থাকলে প্যাঁচায় ছোঁ মারবে। এর মধ্যে বিড়াল জাল থেকে কোনোরকমে বের হলে সেই মুহূর্তেই তার ভবলীলা শেষ। তথাপি, এভাবে তো নিজেকে শেষ হতে দেওয়া যাবে না। বরঞ্চ, এভাবেও যাতে ফিরে আসা যায়, এই দৃঢ়তা মনে নিয়ে, বিপদে বিচলিত না-হয়ে বরং ধৈর্য ধরে সে বিপদ প্রতিকারের চিন্তা করেছে। সামনে- পেছনে ভেবে দেখে সে বুঝতে পেরেছে, এই সহজ শত্রু বিড়াল ছাড়া তার আর রক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ, তার মতো বিড়ালও যে এখন দারুণ সংকটে, শত্রুর জালে আবদ্ধ। তাই তাকে (বিড়ালকে সংহারের পরিবর্তে) যদি উপকার করা যায়, তাহলে সে হয়তো কৃতজ্ঞতা বশে তার মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে; এবং তার সান্নিধ্যেই অন্যান্য শত্রুর থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। পলিত ইঁদুরটি রাজনীতির মূল তত্ত্বটি বেশ ভালো করেই জানে — এই জগতে কেউ কারও প্রকৃত শত্রু কিংবা প্রকৃত মিত্র নয়, শত্রুতা-মিত্রতা সৃষ্টি হয় নিছক ব্যবহার থেকেই। স্বার্থের কারণেই কেউ কারও শত্রু বা কেউ কারো মিত্রে পরিণত হয়।[১৪] অতএব, প্রবল বলসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিড়াল যেহেতু বিপদাপন্ন, তাই সে (বিড়াল) তার সঙ্গে সন্ধি করতেও অস্বীকার করবে না। শাস্ত্রেও তো এই কথা আছে — প্রবল শক্তিসম্পন্নও বিপদাপন্ন হলে জীবন রক্ষার্থে নিকটবর্তী শত্রুকেও আশ্রয় করা যায়।[১৫] এইসব ভেবেচিন্তে (একটু আগেই যে বিড়ালের প্রতি দমন বা দণ্ডনীতি প্রয়োগ করতে গিয়েছিল) সেই পলিতকেশ ইঁদুর (এখন সামনীতি অবলম্বন করে) বিড়ালের অতি কাছে গিয়ে তার কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করে, এবং সে-ই যে তাকে চরম বিপদ থেকে মুক্ত করতে এসেছে সেকথা সে জানায়। তবে একটি শর্তে, সে যেন তাকে হত্যা না-করে। পণ্ডিত বিড়াল নিজের প্রাণ সংশয়ের কথা চিন্তা করে যেন তাদের পূর্ব শত্রুতা মনে একদম জায়গা না-দেয়—এই তার আর্জি। যেহেতু, তারা বর্তমানে উভয়েই মহাসংকটে। ফলত, নিজেদের সংকট মুক্তির কথা ভেবে অন্যতা এখন পরস্পরের শত্রুতার পরিবর্তে সমঝোতার (সন্ধির) প্রয়োজন। ইঁদুর বিড়ালকে মনে করিয়েছে — একই বৃক্ষের সঙ্গে তাদের দুজনের চিরকালের সম্পর্কের কথা, সে থাকত গাছের উপরে আর ও থাকত নিচে (অনেকটা কেন্দ্র ও রাজ্যের মতো) তাই তার বিপদে সে (ইঁদুর) যেমন তাকে রক্ষা করবে, তেমনি তার বিপদে সেও (বিড়ালও) নিশ্চয় রক্ষা করবে, ইত্যাদি। ইঁদুরের এইসব যুক্তিপূর্ণ কথার (পরস্পর গুণকীর্তন, উপকার প্রদর্শন, সম্বন্ধাখ্যাপন প্রভৃতি সামনীতির)[১৬] মর্মার্থ বিচক্ষণ বিড়ালের বুঝতে একমুহূর্তও দেরি হয়নি। নিজের শোচনীয় অবস্থা অনুভব করে এবং ইঁদুরের সাহায্য ছাড়া তার উদ্ধার হওয়া অসম্ভব বুঝে বিড়ালও ভেবেছে চরম বিপদে এমন সুযোগ একেবারেই হাত ছাড়া করা উচিত নয়। তাই সেও পরিস্থিতির চাপে নিজের ক্ষমতার বড়াই ত্যাগ করে, পলিতকেশ ইঁদুরের শরণাগত হয়ে তার রূপ, গুণের প্রশংসা করে, উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকারের সবরকম আশ্বাস দেয়। এমনকি, তাকে তার পরম বন্ধু বলে সম্বোধন করে সাম-সন্ধিতে সম্মতি জানায়। এভাবে উভয়ের পারস্পরিক প্রয়োজনের খাতিরে একদা দুই শত্রুর মধ্যে মিত্রতা (সন্ধি) সম্পাদিত হলে দুর্বল ইঁদুর তার অপর দুই শত্রু বেজি ও প্যাঁচার থেকে রক্ষার নিমিত্ত বিড়ালের একেবারে কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ইঁদুরকে বিড়ালের কোলের মধ্যে এমন বিলীন হতে দেখে ধূর্ত বেজি ও তীক্ষ্ণ চঞ্চু-নখযুক্ত প্যাঁচা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ইঁদুর খাওয়ার আশা ত্যাগ করে। লক্ষণীয়, ইঁদুরের মধ্যম প্রকার শত্রু হওয়ায় বেজি ও প্যাঁচা ইঁদুর অপেক্ষা বলবান হলেও বিড়াল অপেক্ষা ছিল দুর্বল। তাই যতক্ষণ দুর্বল (ইঁদুর) অপেক্ষাকৃত বলবান শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করেনি, বিশেষত, বলবান শত্রু (বিড়াল) ও যখন নিষ্ক্রিয় (জালে আবদ্ধ), ততক্ষণ দুর্বল ইঁদুরের উপর বেজি ও প্যাঁচা আক্রমণ করতে (যান) উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ইঁদুর মধ্যম প্রকার শত্রুরা তাকে যাতে আঘাত করার সুযোগ না-পায় সেজন্য সে কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে সহজ শত্রুর (বিড়ালের) সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নেয়। ফলত, বেজি ও প্যাঁচা (মধ্যম শত্রু) ইঁদুর অপেক্ষা বলবান হওয়া সত্ত্বেও ইঁদুরের কূটনীতির কাছে তারা হার মানে। শুধু তাই নয়, তারা উভয় শত্রুর (বিড়াল-ইঁদুরের) পরস্পর সন্ধিতে হয়তো নিজেরাই ভীত হয়ে ইঁদুরকে খাওয়ার আশা ত্যাগ করে শেষপর্যন্ত (নিজেদের দুর্বলতা বুঝে) স্ব স্ব স্থানে চলে যায়। এভাবে ইঁদুরের চরম শত্রুই (বিড়াল) পরম মিত্র হওয়ায় ইঁদুরটি আপাতত রক্ষা পায় এবং রাজমণ্ডলের মূল প্রকৃতি (বিজিগীষু-ইঁদুর, অরি-বিড়াল, মধ্যম-বেজি ও প্যাঁচা, উদাসীন-ব্যাধ) চতুষ্ক-মণ্ডলের ধারণাটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

বিড়ালের সান্নিধ্যে প্রাথমিক ভাবে অপরাপর (মধ্যম) শত্রুর থেকে ভয়মুক্ত হয়ে ইঁদুর এবার বিড়ালের সঙ্গে সন্ধির শর্ত অনুসারে একটু একটু করে তার জালমুক্ত করতে থাকে। চণ্ডালের ভয়ে বিচলিত বিড়াল তাকে তাড়াতাড়ি জালমুক্তির অনুরোধ জানায়, কিন্তু বিচক্ষণ ইঁদুর জানে যে, এখুনি জালমুক্ত হলে পুনরায় তার জীবনে আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। কারণ, বিড়ালের সঙ্গে তার যতই সন্ধি হোক-না-কেন, সে তো আদতে তার শত্রুই। শুধু তাই নয়, বলবান শত্রু, তাই এক্ষুনি জালমুক্ত করা হলে সেই বিড়াল তৎক্ষণাৎ সন্ধির কথা ভুলে তাকে খেয়ে নিতেও পারে। শাস্ত্রে আছে-বলবানের সঙ্গে সন্ধি করা হলেও সর্বদা তার থেকে সাবধানে থাকা উচিত।[১৭] সন্ধি করেও অনেক সময় মিত্র মিত্রকে হত্যাও করেন। এইসব ভেবেচিন্তে ইঁদুর জালের একটি সুতো বাদ রেখে বিড়ালের সমস্ত জাল কেটে চণ্ডালের আসার অপেক্ষায় থাকে। তারপর যমদূতের ন্যায় হঠাৎ চণ্ডালকে আসতে দেখে ইঁদুর তৎক্ষণাৎ জালের অবশিষ্ট সুতোটি কেটে দেয়। তখন পাশমুক্ত বিড়াল চণ্ডালের ভয়ে (নিজের জীবন বাঁচাতে) অতি দ্রুত বট গাছে উঠে যায় এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইঁদুরটিও তার কূটবুদ্ধির জোরে ভয়ংকর শত্রুদের (বেজি-প্যাঁচা-বিড়াল ও ব্যাধের) কবল থেকে একে একে মুক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত নিজের প্রশস্ত দুর্গে ফিরে যায়।

আমাদের মনে হয়, এখানে ইঁদুর, বিড়াল, বেজি ও প্যাঁচা, ব্যাধ সকলেই যেন এ যুগের এক-একটি রাজনৈতিক দলের বা নেতার প্রতিনিধি। রাজক্ষমতা লাভের জন্য তাঁদের মধ্যে নিরন্তর খেয়োখেয়ির প্রক্রিয়া যেমন চলে তেমনি নিজেদের সংকট মুক্তির জন্য প্রায়শই এক দলের সঙ্গ ছেড়ে অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টাটাও চালাতে থাকেন। দিনরাত্রির পরিবর্তনের হয়তো কিছু সময় লাগে; কিন্তু তাঁদের বিগ্রহ বা সন্ধি, শত্রুতা বা মিত্রতার সম্পর্ক পরিবর্তনের কিছু সময় লাগে না। বাইরের আচার-আচরণ থেকে বোঝা যায় না তাঁদের মনের অভিসন্ধি কী। তাঁরা ভাবেন এক, বলেন আর-এক, কাজের সময় হয় অন্যটি। বস্তুত, রাজনৈতিক দলগুলি বা নেতারা যতই সামাদি নীতি অবলম্বন করে উপকার করা বা বিপন্মুক্তির আশ্বাস দিক-না-কেন, সেগুলির মূলে থাকে কিন্তু কোনো-না-কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ছাড়া একটি পাও তাঁর ফেলেন না। আপন স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তাঁরা স্থান-কাল-পাত্র-ন্যায়-নীতির কোনো তোয়াক্কা করেন না। স্বার্থের কারণেই তাঁরা শত্রুতা বা মিত্রতা সম্পাদন করেন।[১৮] অর্থাৎ স্বার্থ থাকলে তাঁরা অপছন্দের ব্যক্তির সঙ্গেও যেমন মিত্রতা করেন, তেমনি আবার স্বার্থ ফুরোলে পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদও করেন বা উদাসীন থাকেন। বস্তুত, রাজনৈতিক নেতাদের শত্রুতা বা মিত্রতার ভাবনা বড়ই আপেক্ষিক। তাই বাইরে বাইরে একজন অন্য জনের প্রতি বা একদল আর-এক দলের প্রতি যতই মিত্রতা বা শত্রুতা দেখান-না-কেন, ভিতরে ভিতরে তাঁরা কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রু মনোভাবই পোষণ করেন। এই জগতে চিরস্থায়ী ভাবে কেউ কারও শত্রু বা কেউ কারও মিত্র নন। যে-কোনো শত্রুতা (বিগ্রহ) বা মিত্রতা (সন্ধি) একমাত্র স্বার্থের কারণেই জন্ম নেয়— এই কথা বহুকাল আগে মহাভারতে পাওয়া গেলেও এর প্রাসঙ্গিকতা যে কোনো কালেই অস্বীকার করা যায় না, তা এ যুগের স্বার্থপর মানুষগুলি থেকে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল বা দলীয় নেতাদের ব্যবহারের দিকে তাকালে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায়। আলোচ্য গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে বর্তমানের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা বা আচরণের কোথাও কোনো অংশে কাকতালীয় ভাবে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যদি যায়, তাহলে তা অবশ্যই ত্রিকালদর্শী ঋষি-কবির দূরদর্শিতা। সেক্ষেত্রে বিড়ালের সঙ্গে ইঁদুরের সমঝোতায় বিড়াল বা ইঁদুরের উভয়ের যেমন সংকট-মুক্তি হয়েছিল, বিশেষত, পলিত ইঁদুরটি কূটনীতির জোরে যেভাবে শত্রুদের চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল, বর্তমানে সংকটাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কি সমঝোতার খাতিরে আদতে তাদের সংকটাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে? সেটাই এখন দেখার।

তথ্যসূত্র

১। প্রব্রুহি ভরতশ্রেষ্ঠ ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ। মহা. ১২.৫৬.৮

২। মহা. ১২.১৩৪/১৩৬.১৮

৩। এম. আর. কালে, (সম্পা.) পঞ্চ. পৃ ৬৭

৪। ইয়মাপত্সমুত্পন্না সর্বেষাং সলিলৌকসাম্। শীঘ্রমন্যত্র গচ্ছামঃ পন্থা যাবন্ন শুষ্যতি।। মহা. ১২.১৩৪৭

৫। অনাগতমর্থং হি সুনৈর্যঃ প্রবাধযেত্। স ন সংশ্রমমাপ্নোতি রোচতাং ভো ব্রজ্যমহে।। তদেব ১২.১৩৪.৮

৬। যানং শক্রং প্রতি গমনম্। কুল্লূককৃতটীকা-মনু. ৭১৬০
৭। দ্বিধাকারং ভবেদ্ যানং ভয়ে প্রাণার্থরক্ষণম্। এক-মন্যদ্ধিগীষোশ্চ যাত্রালক্ষণমুচ্যতে। পঞ্চ. ৩.৩৭
৮। রাজা আত্মদ্রব্যপ্রকৃতিসম্পন্ন নযস্যাধিষ্ঠানং বিজিগীষুঃ। অর্থ. ৬.২.১৩
৯। সম্পন্নস্তু প্রকৃতিভির্মহোতসাহঃ জেতুমেষণশীলশ্চ বিজিগীষুরিতিস্মৃতঃ। কাম. ৮.৬
১০। একার্থাভানিবেশিত্বমরিলক্ষণমুচ্যতে। তদেব. ৮. ১৪
১১। মূলপ্রকৃতযস্ত্বেতাশচতশ্রঃ পরিকীর্তিতাঃ। তদেব. ৮.২০ মনু. ৭.১৫৫-১৫৬
১২। তস্য মূলং সমাশ্রিত্য কৃত্বা শতমুখং বিলম্। মহা. ১২.১৩৪.২১
তুল. হিরণ্যকোহপি সহস্রমুখবিলদুর্গং প্রবাধোহ'কুতোভয়ঃ। পঞ্চ. পৃ. ৯৯
১৩। কাম. ৮.১৪
১৪। অর্থতন্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তুথা। মহা. ১২.১৩৪.১১০
১৫। বলিনা সন্নিকৃষ্টস্য শয়োরপি পরিগ্রহঃ। তদেব. ১২.১৩৪.৪৪
১৬। পরস্পরোপকরাণাং কীর্তনং গুণকর্মসু। সম্বন্ধস্য সমাখ্যানমাযত্যঃ সম্প্রকাশনম্। বাচ্য পেশলযা সাধু ভাবানহমিতি চার্পণম্।ইতি সামপ্রভেদজ্ঞেঃ সাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্। কাম. ১৮.৮-৫ তুল. অর্থ. ২০.১০.৪৮. নীতি. ২৯.৭০
১৭। মহা. ১২.১৩৪.১০৮-১০৯
১৮। শক্রশ্চ মিত্রতামেতি সার্থো হি বলবত্তরঃ। মহা. ১২.১৩৪.১৩৮

গ্রন্থপঞ্জিঃ

অমর সিংহ, অমরকোষ, হরগোবিন্দ শাস্ত্রী (সম্পা.), বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ২০০৮ (পু. মু.) কামন্দক, কামন্দকীয়নীতিসার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.), কোলকাতা এ্যাসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৮ (পু. মু.) কামন্দক, কামন্দকীয়নীতিসার, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কোলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯ কৌটিল্য, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম, আর পি কাঙলে, (সম্পা.), দিল্লী মোতিলাল বারাণসী দাস পাবলির্সাস (প্রা. লি.), ২০০৬ (পু.মু.)